মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির ভিতরে যেই ঢুকে পড়ে কেউ,
তখনই লাফিয়ে ওঠে জগতের রঙ্গ ও কৌতুক?

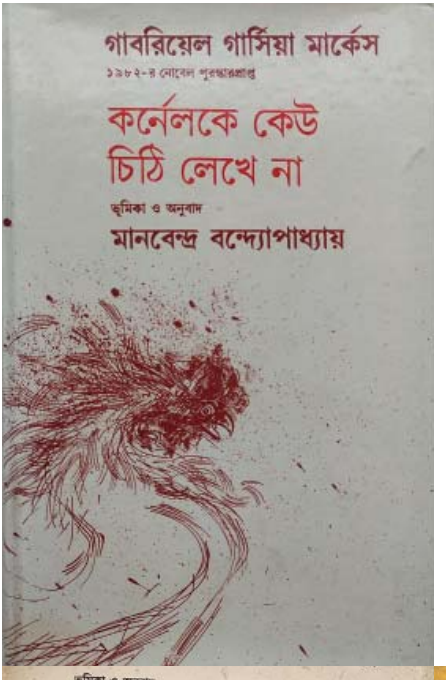
গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
১৯৮২-র নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত
কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না
ভূমিকা ও অনুবাদ
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

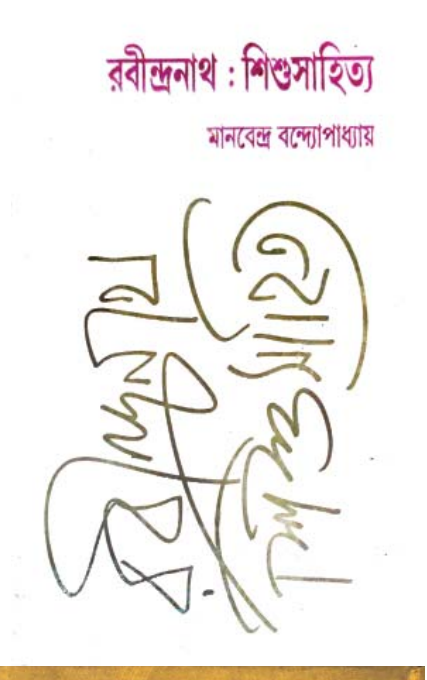
রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

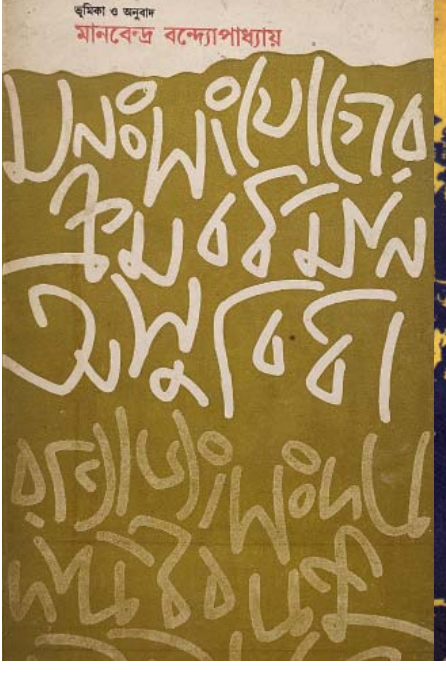
ভূমিকা ও অনুবাদ
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাস্তু
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবেন্দ্র
বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫.৪.১৯৩৮-৪.৮.২০২০

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রকাশিত হল 'হরপ্পা'-র শ্রদ্ধার্ঘ্য

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা

সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা

অরিন্দম দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর দাশ, দেবব্রত ঘোষ,
প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, মৈনাক বিশ্বাস, সৌম্যদীপ

সম্পাদক

সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

এই করোনাকালের সংকটসময়ে নানা অঘটন যখন পরপর ঘটে চলেছে, তখন প্রায় সকলের অজ্ঞাতে একে-একে বিদায় নিচ্ছেন বিবিধ ক্ষেত্রের বহু দিকপাল। কবি-প্রাবন্ধিক-গল্পকার-ঔপন্যাসিক এবং অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫.৪.১৯৩৮-৪.৮.২০২০) সে-তালিকায় অন্যতম একজন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ, তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয় ও পোল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা। কর্মজীবনের শুরু মায়ানমারের রেঙ্গুনে অধ্যাপনার কাজে। পরে

অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি *রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য, আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ, বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব* প্রভৃতির মতো প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন, লিখেছেন বহু গল্প-উপন্যাস, এমনকি *ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস*। তবে অনুবাদক হিসেবে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সব মহলেই বহুল চর্চিত। অনালোকিত বিশ্ব সাহিত্য ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় লেখা সাহিত্যরচনাকে তিনি বাংলায় তরজমা করেছেন। স্বীকৃতির তালিকা দীর্ঘ না-হলেও শিশু সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'খগেন্দ্র মিত্র স্মৃতি পুরস্কার', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' পেয়েছিলেন; পাবলো নেরুদা, লাতিন আমেরিকার উপন্যাস সমূহ, হুয়ান রুলফোর কথাসমগ্র, শার্ল পেরোর রূপকথা, মিরোস্লাভ হলুবেরের কবিতা, নিকানোর পাররার কবিতা, পিটার বিকসেল, একাধিক স্প্যানিশ গল্প ইত্যাদি তরজমার জন্য ভারতীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমি থেকে তিনি পান 'অনুবাদ পুরস্কার'।

তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে 'হরপ্পা'-র এই নিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রবন্ধের দুটি পূর্বপ্রকাশিত। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার একটি তালিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকলেও সে-কাজ সম্পন্ন করতে না-পারায় আমরা আন্তরিকভাবে ব্যথিত। আশা রাখি, অদূর ভবিষ্যতে এ কাজ সম্পূর্ণ হবে।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়:
এক বাকশ্রমিকের গল্প ৯

অভিজিৎ রায়
এইখানে, এক্ষুণি... অথবা অনির্দেশ্য:
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ৪৯

সৌম্যদীপ
অনুবাদেন্দ্র : কবিদের কবি
কিছু কৈশোর-স্মৃতি ৭৩

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: এক বাকশ্রমিকের গল্প

প্রস্তাবনা

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের হয়তো-বা শেষ নাটক, *The Tempest* ('তুফান', ১৬১১)। নাটকের তিন প্রধান কুশীলব: প্রসপেরো, ক্যালিবান, এরিয়েল। প্রসপেরো, কোথাকার-কে, সহোদর ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে তাজমুকুট-হারা উদ্বাস্তু; আগাম-জানান নেই, নেই পূর্বাভাস, কন্যা মিরান্ডা সহ মত্ত ঝঞ্ঝাতাণ্ডবের মতো উদয় হয়ে হাতিয়েছে ক্যালিবানের দ্বীপ—যে স্থলভূমির উপর তার মা সাইকোরাক্স-এর (অলিখিত) ফারমানে, পাকা ক্যালিবানের হক।

গোড়ায়-গোড়ায় অযাচিত মেহমানটি হৃতসম্পদের সনে মিষ্টিমধুর ব্যবহার ক'রলেও, কয়েক দিনের মধ্যেই স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝিয়ে ছাড়ে, আদতে মনিব কে, কে-ই বা চাকর—দিবারাত্র ক্যালিবানের প্রতি আচরণে রূঢ়, কেবলই বর্ষায় তার ওপর বুলির গুলিতে ঠাসা হুকুম। ক্যালিবানও নাছোড়বান্দা। খাটাখাটনিতে গাফিলতি, পায়ে-পায়ে খটাখটি, মুখে-মুখে চোপা, অবাধ্যতার কোনো ধরনেই কামাই নেই তার। ক্যালিবানের খেউড়ে কথা-কাটাকাটি, প্রত্যুত্তরের আস্পদ্দা, খেপিয়ে তোলে খ্যাঁকখ্যাঁকে প্রসপেরোকে। চেঁচায় সে:

When thou didst not, savage
Know thine own meaning, but wouldst gabble like
A thing most brutal, I endow'd thy purposes
With words, that made them known; (অঙ্ক এক, দৃশ্য ২)

দাবি প্রসপেরোর: অবোলা বুনো ক্যালিবানের জংলি আওয়াজ-পত্তর তারই প্রসাদে শব্দদীক্ষায় অর্থময় আজ। প্রসপেরোর, শুধু প্রসপেরোর কেন মিরান্ডারও, অযাচিত প্রশিক্ষণে কোন্ লাভটি হয়েছে তার, জানায় তা ক্যালিবান চমকদার রঙিল বিভঙ্গে:

You taught me language; and my profit on't
Is, I know how to curse. (অঙ্ক এক, দৃশ্য ২)

ঠেস ক্যালিবানের: প্রসপেরো-শেখানো লব্জ তার অধিগত বলেই তো সে মনিব মহোদয়কে চোখা-চোখা খিস্তিতে বিঁধতে পারঙ্গম।

১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফর কলম্বাসের আমেরিকা ভূখণ্ডে পদার্পণের একশো চোদ্দো-পনেরো বৎসর পর, ১৬০৬-এ,

'ভার্জিনিয়া কম্পানি অফ লন্ডন' নামক সওদাগরি হৌস—এখনকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল—ভার্জিনিয়া-য় গাড়ে উপনিবেশ। ওই কম্পানির ঝান্ডাস্বরূপ সিন্ধুরথ 'Sea Venture', ১৬০৯-এর ২৪ জুলাই, বারমুডা-র ধার-বরাবর জনবসতিহীন এক দ্বীপের কাছে প্রচণ্ড তুফানের কবলে পড়ে। পরিণাম: চুরমার, কম্পানির সাধের অর্ণবপোত; ভরাডুবি জাহাজের দেড়শো সারেং-খালাসি দশ মাস বারমুডায় আটক; অবশেষে, কম্পানির সাহায্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরিত্যক্তরা নিজেরাই বানায় দুটি নৌকো, 'Patience' ও 'Deliverance'; লশকরদের ধৈর্যেই আসে পরিত্রাণ, ১৬১০-এর ২৪ মে, ভার্জিনিয়ার উপকূলে ভেড়ে সক্কলে। নাবিকদের পুনরুত্থানের আজবে লন্ডনের নাগরিকসমাজ তুমুল আলোড়িত।

তখনও 'ভার্জিনিয়া কম্পানি'র সদর আপিসে পৌঁছয়নি সমুদ্রাভিযাত্রীদের পুনঃআবির্ভাবের সুসমাচার। 'Sea Venture'-এর misadventure-এ নিরতিশয় বিব্রত, হৌসের আমলা-আধিকারিকদের প্রণোদনায়, ১৬১০-এর শুরুর দিকে কম্পানি ছেপে বের করে নাতিদীর্ঘ সাফাইপত্র: *A True and Sincere Declaration of the purpose and ends of the Plantation begun in Virginia*। ওই বছরেই, সম্ভবত নভেম্বরে, প্রকাশিত হয় পুস্তিকাটির সম্প্রসারিত সংস্করণ, বহরেও বাড়ে শিরোনাম: *A True and Sincere Declaration of the purpose and ends of the Plantation begun in Virginia or A true Declaration of the estate of the Colony*

in Virginia, with a confutation of such scandalous reports as have tended to the disgrace of so worthy an enterprise।

সন্দেহের অবকাশ নেই, নৌযাত্রীদের অন্তর্ধান ও অভ্যুদয় রহস্য নিয়ে লন্ডনবাসীদের জল্পনা, শুঁড়িখানায়-খানায় আড্ডা, 'ভার্জিনিয়া কম্পানি'র অবিশদ-বিশদ প্যাম্ফলেট, ইত্যাদি আরও মুখরোচক মশলায় জারানো, ১৬১১-র *The Tempest*। এতৎসত্ত্বেও, মজুত তাতে, তদানীন্তন ইংল্যান্ডের লোককথায় কিংবা সরকারি দস্তাবেজে না-খোঁজ, ঔপনিবেশিক অভিযান বিষয়ে কটু কিছু পর্যবেক্ষণ। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য: উড়ে-এসে-ঘাড়ে-বসা, উটকো প্রভু প্রসপেরো ও তার নিখরচায় পাওয়া নয়া দুই দাসের সম্পর্কগ্রন্থি—একজন, মুক্তিকামী কিন্তু পোষ্যতায় সুশীল এরিয়েল, দ্বিতীয়জন, নিঃশঙ্ক না-পোষ্যতায় দুঃশীল ক্যালিবান।

সতেরো শতক হতেই ইউরোপের সাহিত্যে, ইতিহাসচর্চায়, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় একরকম মধ্যমণি, প্রসপেরো-এরিয়ল-ক্যালিবান ত্রিকোণ।

উনিশ শতকের শেষ থেকে ইউরোপের উপনিবেশে-উপনিবেশে ছড়ালে বিদ্রোহ, ত্রিকোণটি একরকম আন্দোলনেরই রূপক হয়ে দাঁড়ায়। কেমন ছিল সে রূপকের চালচরিত্র, সে-প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে দরকার, *Tempest*-কে ঘিরে নানান তুফানি ঘূর্ণির কাজ-চালানোর মতন রূপরেখা।

কটি মাইলফলক:

ইউরোপ

• ১৬৭০। *The Tempest* অনুসরণে বেরোয়, John Dryden ও William Davenant-এর *The Tempest; or, the Enchanted Island*। শেক্সপীয়র-ভাঙা নব্য এ নাট্য-উদ্যোগে, বাড়ে এরিয়লের গুরুত্ব, কমে ক্যালিবানের।

• আঠারো শতকের Enlightenment যুগে, যেন-বা কুসংস্কার-বিরুদ্ধ যৌক্তিকতাবাদ/rationalism-এরই প্ররোচনায়, *The Tempest*-এর তামাম ভাষ্য-রূপান্তরে, প্রসপেরোর জয়জয়কার—পরিণত সে আলোকভাস্বর সৎসংস্কারকের ধ্যানবিগ্রহে।

• মজার কথা, উনিশ শতকীয় রোমান্টিকরা যত-না খোঁচান যুক্তিমন্ত বুদ্ধিবাগীশদের, 'মস্তিষ্ক' বনাম 'হৃদয়' দ্বন্দ্বে রায়-সায় জোগান 'হৃদয়'-এর পক্ষে, তাঁরাও প্রসপেরো-মুগ্ধ। পরিপ্রেক্ষিত অবশ্য আলাদা: রোমান্টিক বিবেচনায়, বিজেতা পুরুষটি আদৌ আবেগে রহিত, নিছক মেধায় মেধাকার নন, বরং, 'ব্যক্তিক আত্মতা'র প্রতিভূ, মদ্‌ময় যাতনা-বাসনার আধার। এরই কোল ঘেঁষে, 'কৃত্রিম' নাগরিকতায় বিবিক্ত ও 'প্রাকৃত' সততায় বিশ্বাসভাজন রোমান্টিককুলের আন্তরিকতায়, ক্যালিবানের কপালে জোটে 'noble savage'/'জাত্য বর্বর'-এর আদুরে শিরোপা।

• ১৮৫৯। প্রকাশিত হয় চার্লস ডারউইন-এর *On the Origin of Species by means of Natural Selection*। জোট বাঁধে

লেখকের সঙ্গে

রোমান্টিক ভাবকল্পনা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিভিন্ন প্রজাতির উদয়-বিলুপ্তির তথ্যনির্ভর ধারাবিবরণী: চড়ে, ক্যালিবানের 'জাত্য বর্বরতা'র কদর।

উনিশ শতকের মাঝ-বরাবর, খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্ব ও নব্য-বিজ্ঞানের মস্ত টক্করে অন্যতম হাতিয়ার, ক্যালিবানের 'শারীরিক বিকৃতি'/'deformity' ও 'সহবতে অতালিমি'/'incivility'। এর সাক্ষাৎ ফল, ড্যানিয়েল উইলসন-এর *Caliban: The Missing Link* (১৮৭৩)। ক্রমশ বদ্ধমূল হয় ধারণা: ডারউইন-বিবৃত মানুষী বিবর্তনের আখ্যানে একটি যে ফাঁকা কুলুঙ্গি, বেপাত্তা আন্টা রয়ে গেছে, সেটি ভরাতে তাকাতে হবে, ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অধীন উপনিবেশে; এবং, বিসরিত আদিম সে প্রত্নমানবের, হলেও মিটমিটে স্মৃতিদীপ, ক্যালিবানই সেরা প্রতীক।

• ১৯২৩। বেরোয়, 'repression'/'অবদমন', 'Unconscious'/'অবচেতনা', 'inhibition'/'সংকোচ', 'anxiety'/'উদ্বেগ', 'death-instinct'/'মৃত্যু-এষণা', ইত্যকার হাজারো তত্ত্বকল্পের জনক, সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর *The Ego and the Id*। ওই গ্রন্থেই ফ্রয়েডের মোক্ষম-ধারণা 'অবচেতনা' উত্থাপিত হয় বীজগাণিতিক সরলতায়: 'The repressed is the prototype of the unconscious' ('অবদমিতই অবচেতনার আদিকল্প')। এর বছর তিন পর, ১৯২৬-এ, *Inhibitions, Symptoms and Anxiety* গ্রন্থে, লিখতে কলম কাঁপে না ফ্রয়েডের: 'The repressed

is...as it were, an outlaw;…subject [only] to laws which govern the realm of the unconscious' ('অবদমিত যেন-বা দণ্ডিত নির্বাস; বাঁধা কেবল অবচেতনার অনুশাসনে')।

The Ego and the Id-এই পরিচ্ছন্ন হয় ফ্রয়েড-কল্পিত মানবিক চিত্তভূমির ত্রিস্তর ভাগ-পরিচিতি। সেই মানচিত্র অনুযায়ী, মানবচিত্ত/psyche-র তিন অঙ্গ: Ego/অহং; Id/জন্মমুহূর্তে লব্ধ কায়িক ঈপ্সা, ক্ষুৎকাতরতা, জৈবিক দাবি-পূরণের অ-সবুরে চাড়, যার একটি, libido বা যৌনতাড়স; Super-ego/অতি-অহং, বেলাগাম Id-এর বিপরীত-মেরুতে স্থাপিত, অহংকে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণে মেজেঘষে ভব্যিযুক্ত করার নিয়মকল।

কে জানে কার জাদুমন্ত্রণায়, ফ্রয়েডের চিত্ত-আলেখ্যখানি *The Tempest* সংক্রান্ত সাহিত্য-আলোচনায় খুব সত্বর এক্কেবারে জলভাত। আপাত-ফ্রয়েডীয়, দশ নকলে খাস্তা সেই মীমাংসা: প্রসপেরোর অহং দ্বিবিশ্লিষ্ট; যে উভটানে ছিন্নভিন্ন তার সত্তা, তার একটি ক্যালিবান-নাম্নী libido, অন্যটি, এরিয়েল-নাম্নী Super-ego। আশ্চর্যং!

অশেষ সৌভাগ্য, W. H. Auden-এর উপর ফ্রয়েডের প্রভূত প্রাভব সত্ত্বেও, vers libre/ মুক্তবৃত্ত ছন্দে রচিত তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'The Sea and the Mirror: A Commentary on Shakespeare's *The Tempest*' (১৯৪২-৪৪), তৎ-কালীন বিদ্যায়তনিক তারল্যে দুষ্ট, দূষিত নয়। এতেই, 'Caliban to Audience' অংশে, শ্রোতা-দর্শক পায় সুলুক:

'It is thanks to…prohibitive frontiers…that we know against whom to rebel' ('নিষেধের বাঁধ, বারণের বাধার সৌজন্যেই বুঝি আমরা, যুঝতে হবে কার সঙ্গে')।

• ১৯২২। ইংরেজি ভাষাজগতে চমকা-বিপ্লব ঘটায় আয়ারল্যান্ড-আগত James Joyce-এর উপন্যাস *Ulysses*। সাত-সতেরো স্বখচিত জোড়কলমি শব্দ, যখন-তখন অন্বয়ের খাতবদল—উৎপটাং নানান ব্যভিচারে 'ব্যাকরণ-অনুমোদিত', 'ধ্রুপদী' ইংরেজির তো যাই-যাই দশা।

Ulysses-এর সূচনাপর্বেই আছে এ দৃশ্য: নব্য-কাব্যের দিশারী/'bard' হওয়ার খোয়াবে বিভোর, উপন্যাসের মুখ্য নাটুয়া, অপরিসীম বিরক্তি সহকারে একখানা আরশি-র দিকে চেয়ে; তার অবলোকন-ধরনে আমোদিত, পাশে উপবিষ্ট বন্ধু মস্করা ক'রে বলে, 'The rage of Caliban at not seeing his face in the mirror' ('আয়নায় নিজেকে না পেয়ে ক্যালিবানের আক্রোশ'); সঙ্গেসঙ্গে 'আত্মদর্শ'-এর উপমাটি প্রসারিত করত, ইংল্যান্ডের কলোনি আয়ারল্যান্ডের হবু-কবি ঝাড়ে তার তখনও না-লেখা উপন্যাসের ভিত-বয়েৎ, 'It is a symbol of Irish art. The cracked looking glass of a servant.' ('আইরিশ শিল্পের উপমান—তোবড়ানো মুকুর, ভৃত্যের')।

উপনিবেশ

• ১৯০০। বেরোয়, Uruguay/ইউরোগোয়াই-এর প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক হোসে এনরিকে রোদো-র, হয়তো-বা সবচেয়ে

প্রসিদ্ধ বই, *Ariel*। যদিচ, খাস শাদা আদমির ভগবদ্দত্ত বৌদ্ধিক শ্রেয়তার দম্ভ, (এবং, সে-সুবাদে প্রসপেরোর), রোদো-র অসহ্য বোধ হতো, এরিয়েলের প্রতি ছিল তাঁর অপার মমতা। রোদো-র চোখে: শেক্সপীয়রের ওই 'gentle sprite'/'আনম্র হুরি', লাতিন আমেরিকি সভ্যতার অমায়িকতায় সম্ভ্রান্ত, সত্যকার অন্তঃসারের নিদর্শ; আর, কদাকার বদখদ ক্যালিবানে মূর্ত ইঙ্গো-মার্কিন অহমিকার জান্তবতা। ডারউইনি বিবর্তনবাদের স্বকৃত বিস্তারে লিখেছিলেন তিনি: 'ক্যালিবানে প্রতিফলিত পাশবিক ইন্দ্রিয়ম্মন্যতাকে পরিমার্জনত ক্রমশ এগোচ্ছে মানুষ, সূক্ষ্মশরীরী আকাশপরি এরিয়লে প্রতিফলিত আদর্শের দিকে'। রোদো-র এই গোত্রবিচার, কিছু দিন ভালোই প্রভাবশীল ছিল লাতিন আমেরিকায়। এরই আগাম-নোটিশ যেন: *Ariel* প্রকাশের বছর দুই আগে, ইস্পানি-মার্কিন যুদ্ধের বৎসর, ১৮৯৮-তে, আর্জেন্টিনার এক লেখক, ইস্পানির ট্যাঁকশালে কুঁদেছিলেন চমকপ্রদ নয়া-শব্দ, *Calibanesque*—মানে ছিল যার, ইঙ্গো-মার্কিন চরিত্রের ঘৃণ্য, ন্যক্কারজনক উপাদানের সমষ্টি।

• এদিকে, শ্যামল বঙ্গদেশে, উনিশ শতকের আটের দশকে, আমাদের আধুনিকতার নটপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষায় সম্ভবত প্রথম তুলনামূলক সমালোচনার দৃষ্টান্ত, তাঁর 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' নিবন্ধটির মুখপাত ক'রেছিলেন এই স্নিগ্ধভাষে: '[মিরন্দা ও শকুন্তলা] উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি' (*বিবিধ সমালোচনা*, ১৮৭৬)।

এরিয়ল-ক্যালিবানকে জাদুবলে কয়েদ ক'রে ধমকে-চমকে চব্বিশ ঘণ্টা গাধার খাটুনি খাটিয়ে মারে যে, সে হল রাজর্ষি!

'রাজর্ষি'তেই-বা থামলেন কেন বঙ্কিম—নফরদের প্রতি মনিবের ইতর ব্যবহার নিয়ে হেলদোলের তিলেক প্রমাণ নেই তাঁর প্রবন্ধে; পার্শ্বে তো বিশ্বামিত্র ছিলেনই, প্রসপেরোকে 'রাজ-ঋষি'র থাক থেকে আরও উচ্চকোটির থাক, 'মহর্ষি'র পদে টেনে তুললেই-বা আটকাত কে তাঁকে।

• ১৯০২। হতেই পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা'-র পালটা-জবাব প্রণয়নের গোপন অভিলাষ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের; শেক্সপীয়রের *The Tempest* ও কালিদাসের *শকুন্তলা* নিয়ে আর-এক প্রস্থ তুলনাত্মক প্রতর্কে নামেন তিনি 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে (*প্রাচীন সাহিত্য*, ১৯০৭)। ১৯০৫-এর স্বদেশি যুগের অল্প আগে-পরে মাঝেসাঝে দাগ-কাটা ঘরের ঘের-ঘোরে পড়লেও, রবীন্দ্রনাথই জাতীয়তাবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিকতার অন্যতম পুরোধাপুরুষ।

বিশ্বপথিকের 'শকুন্তলা'-য় যেনতেনভাবে কালিদাসকে জিতিয়ে দেওয়ার দেশোওয়ালি ঝোঁক সত্ত্বেও, *The Tempest* সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি সেখানে ঔচিত্যের গজফিতেয় যেমন কঠোর-কড়া তেমনি অনেকদূর ন্যায়সংগত। যথা: 'আধিপত্য লইয়া দ্বন্দ্ববিরোধ ও প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব'; '[তাতে শুধু] পীড়ন, দমন, শাসন'। ওই দমন-আবর্তে হাল কী এরিয়েল-ক্যালিবানের? জবাব: 'মানুষের

আত্মীয়তা [বঞ্চিত]...[এরিয়েল] স্বাধীন হইতে চায়, কিন্তু মানবশক্তি-দ্বারা পীড়িত অবদ্ধ হইয়া দাসের মতো কাজ [করে]'; 'দানবপ্রকৃতি ভয়ে শাসনে ও অবসরের অভাবে পীড়িত ক্যালিবানের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিল মাত্র, কিন্তু তাহার দন্তমূলে ও নখাগ্রে বিষ রহিয়া গেল'।

যে গোলাম আদপে 'স্তব্ধ' নয়, বরং, অষ্টপহর খিস্তি-মাতোয়াল, সেই ক্যালিবানের গায়ে 'দানবপ্রকৃতি'র কলঙ্কচিহ্ন লেপে রইলেও, রবীন্দ্রনাথের বিবেকী যুক্তিতে, 'কালিবানেস্ক' উপাধিটির যোগ্য প্রাপক প্রসপেরো: 'টেম্পস্ট্ নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই...সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া মন্ত্রবলে প্রকৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন'। না, প্রসপেরো-অধিকৃত 'তরঙ্গঘাতমুখর শৈলবন্ধুর জনহীন দ্বীপে' লালিতা মিরান্দা আর 'সজীব' 'ব্যাপক' 'প্রকৃত' প্রকৃতিতে ফুলের মতো বিকশিত শকুন্তলার ভিতর কণাটুক্ মৌল মিল নেই; এবং না, বিশ্বামিত্র হোন বা না হোন, প্রসপেরো কোনো প্রকারেই 'রাজর্ষি' নন।

• ১৯৬৫। মুদ্রিত হয় স্বনামধন্য নীরদচন্দ্র চৌধুরী-র *The Continent of Circe: Being an Essay on the Peoples of India*। তাতে, হোমারের মহাকাব্য *Odyssey*-র মানুষকে জন্তু বানিয়ে জব্দ করায় পারদর্শিনী ডাইনি Circe ও ক্যালিবান-জননী সাইকোরাক্স-কে সমাসনে বসিয়ে, আত্মপ্রসাদে ডগমগ, লেখেন নীরদচন্দ্র: 'আমি আমার ইউরোপীয় আত্মন্-কে

Circe-এর বিতংস হইতে বাঁচায়ইছি...সক্ষম হইয়াছি আরও দুরূহ কার্যসিদ্ধিতে। মম এরিয়েল-কায়টিকে উদ্ধার করিয়াছি সাইকোরাক্স হইতে, ত্রাসভীষণা অমঙ্গুলে সেই জটেবাড়ি দাঁড়াইয়া যে ভারতে, Circe-এর পিছে'। ইউরোগোয়াই-এর এরিয়েল-আসক্ত রোদো-ও কি এমৎ আত্মঘাতী ত্রাণসাধনে রত হতে পারতেন?

সাইকোরাক্স ও তৎমারফত ক্যালিবানের প্রতি এত গভীর নীরদচন্দ্রের অনুকম্পাভর অপ্রণয় যে তাঁর বাংলা-ইংরেজি রচনাবলির সিংহভাগ কালিবানেস্ক প্রসপেরোর, স্কন্ধারূঢ় ওপরওয়ালার চরণপাতে নমস্কারচুম্বনে-চুম্বনে ব্যয়িত। শ্রাবণমেঘভারে সন্নত সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, নীরদচন্দ্রের *Autobiography of an Unknown Indian*-এর (১৯৫১) উৎসর্গপত্র: 'ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্মৃতিতে/ যা আমাদের দান করলেও আত্মতার অধিকার/ অর্পণ করেনি নাগরিকত্বের সনদ.../(তা-ও) আমাদের অন্তর-গহনে উপ্ত ছিল যত-যা ভালো, যা-কিছু জীবন্ত/ সে-সমস্তের তৈয়ার, ঢালাই ও দ্রুত গলন সম্ভবপর হয়েছিল/ ব্রিটিশরাজের আশিসে'।

পুনশ্চ লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান্স

• বিশ শতকের পাঁচের-ছয়ের দশক। লাতিন আমেরিকা তথা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ক্যালিবান-এ সমননমনস্ক হওয়ার প্রস্তুতি জন্য জোর তরঙ্গঘাত আছড়ে পড়ে ফরাসি মনোবৈজ্ঞানিক ওক্তাভ্ মানোনি-র গবেষণাসূত্রে।

অমিয় দেবের সঙ্গে

আফ্রিকার ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে 'নেটিভ'দের ওপর ফ্রান্সের ফোঁপরদালালি ও অকথ্য অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ, ১৯৫০-এ মানোনি লেখেন গোটা একটি বই; ইংরেজি অনুবাদে নাম যার, *Prospero and Caliban: The Psychology of Colonization*। মানোনি-র (ফ্রয়েডীয়) মনোবিকলন অনুসারে: সুদ্ধু উপনিবেশে অর্জিত অভিজ্ঞতার পুঁজিতে পরিগঠিত হয়নি সাদা আদমির 'ঔপনিবেশিক ব্যক্তিত্ব'; আসলে তা ইউরোপের চিত্ত/psyche-তে অন্তর্নিহিত, অবদমিত/repressed বিবিধ প্রলক্ষণ/trait-এর সংহত ও উদ্দাম প্রকাশরূপ; ব'ললে ভুল হয় না, বহুযুগ গুহ্য, বিকীর্ণ ওই প্রলক্ষণ-সমবায় ওজরে যা দানা বেঁধেছে ইউরো-চিত্তে তা 'প্রসপেরো গূঢ়ৈষা/complex'; সাংঘাতিক ও গূঢ়ৈষাকে প্রশ্নশরে-শরে দীর্ণবিদীর্ণ, বানচাল ক'রতে পারে এক সে-ই যে অহরহ জ্বলছে-পুড়ছে 'অসন্তোষ/resentment'-এর তাপভাপে; 'প্রসপেরো গূঢ়ৈষা'-কে দলেমলে, হৃদয়দৌর্বল্যের পিছুটান পরিহরত পরনির্ভরতার ক্লৈব্য কাটায় যারা, তাদেরই সাধারণ-আখ্যা 'ক্যালিবান'।

এরপর আর রোখা যায় না। মধ্য বিশ শতকে, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান্স-এ *Ariel*-প্রণেতা হোসে এনরিকে রোদো-র গোত্রবিচার পরিপাটি তামাদি—উলটে, এরিয়লের স্থলে সসম্মানে অভিষিক্ত, 'দন্তমূলে ও নখাগ্রে' তথা জিহ্বাগ্রে বিষধারী ক্যালিবান; এই সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মারকস্তম্ভ হিসেবে স্পষ্টসনাক্ত, প্রসপেরো।

১৯৬৯ সনে, Cuba/কুবা-র মার্কসীয় কবি Roberto Fernández Retamar, তাঁর ইউরোকেন্দ্রিকতা-বিরোধী ইস্তেহার, 'Caliban: Towards a Discussion of Culture in Our America'-য় ঘোষণাই করে দেন: 'আমাদের প্রতীক এরিয়ল নয়, যেমনটি ভেবেছিলেন রোদো, বরং, ক্যালিবান— আমাদের সাংস্কৃতিক দুরবস্থা, বাস্তবজীবনকে চিত্রায়িত করার উদ্দেশে ওর চাইতে ওজস্ব, চোখালো উপমা আর দুটি নেই'।

মানোনি প্রস্তাবিত 'প্রসপেরো গূঢ়েষা' প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ২৮ জুলাই ১৯১৪-য় সমারম্ভ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগে, পৌষ ১৩২১-এ বিবরিত রবীন্দ্রনাথের সদুক্তি: 'আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে।...য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে। কিন্তু...যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অন্যায় যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে ('লড়াইয়ের মূল', কালান্তর)।

• ১৯৫৫। বেরোয় ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে অবস্থিত মার্তিনিক দ্বীপের কবি-প্রাবন্ধিক-নাট্যকার এমে সেজেয়ার-এর ফরাসিতে রচিত প্রতিবেদন, ইংরেজি তর্জমায়, *Discourse on Colonialism* ('উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত বয়ান')।

উপনিবেশবাদের একদঙ্গল সাহেব সমর্থক জলবায়ুর দোহাই পেড়ে রটান বাজারে: 'সভ্যতা' জিনিসখানিই ভৌগোলিক খামখেয়ালের ফল; তাহার উন্মেষ যে গ্রীষ্মমণ্ডলে নয়, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে হইবে, নিয়তি-নির্ধারিত তাহা। দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য এই সিদ্ধান্ত, আবহাওয়াবিদে হামবড়াই নিয়ে উত্তপ্ত বিদ্রূপ, চোখা-চোখা রঙ্গব্যঙ্গ, ক্রোধ-উচ্চারে ভরভরতি *Discourse on Colonialism*।

১৯৬৯-এ বেরোয় এমে সেজায়ের-এর ফরাসি নাটক, ইংরেজি তর্জমায় নাম যার, *The Tempest for the Black Theatre*। এতে, হাড়মাস-কালি বেঠবেগার, খামার-কাজের কামিয়া ক্যালিবান আর এরিয়েল, সাদা-কালো বর্ণ-সংকরে মুলাটো গৃহ-পরিচারক। নাটকে, *Discourse on Colonialism*-এর মুখ্য প্রতিপাদ্যটিই পুনঃ পরিবেশিত: উপনিবেশবাদী সংবিধান বাধ্যতই আগাগোড়া জাতি-বিদ্বেষী; কিন্তু, ফাটলে-ফাটলে ফাটা বৈষম্যের সে সংবিধান আপাত-অলক্ষ্য ক্রিয়াবিক্রিয়ায় তথাকথিত আলায়-আলা civilization-এর অগ্রদূতদেরও 'বি-সভ্য'/'decivilize', 'বর্বরায়িত'/'brutalize' ক'রে ছাড়ে; উপনিবেশবাদের ধূর্ত সঞ্চারে, (প্রসপেরো-প্রতিম) সভ্যজান্তা ধরতেই পারে না, 'বিদিগিচ্ছিরি' ক্যালিবান নয়, বরং, সে-ই ক্রমাগত ডুবছে 'পৈশাচিকতা'/'savagery'-র রসাতলে।

মোটকথা: হাত-পায়ের বেড়ি ভাঙতে চেয়েও শৃঙ্খলমোহে আবিষ্ট রক্ষণশীল কিংবা উদারবক্ষ লিবারেল যদি এরিয়লের পক্ষপাতী,

তবে, ঔপনিবেশিকতাসহ তার (চোরে-চোরে) মাসতুতো ভাই পুঁজিবাদকেও নিকেশে উৎসাহীরা, ক্যালিবানের দলে।

'প্রস্তাবনা'র মুখপাত, প্রসপেরো-ক্যালিবানের কথোপকথনের উদ্ধৃতিতে; সমাপ্ত হোক তা ওই কথোপকথনেরই কয়েক কলির বঙ্গানুবাদে:

ক্যালিবান।...প্রথম যখন তুমি এসেছিলে
কত-কী আদর করেছিলে, কত-যে তারিফ; আমাকে তখন তুমি দিতে
সেই জল যাতে ছিল জাম; শেখাতে কেমন ক'রে
নাম দেয় বিপুল আলোকে, এবং কী নাম হবে যে-আলো দুর্বল,
যে-আলো পোড়ায় শুধু দিন আর রাত; তারপর আমি
ভালোবেসেছিলাম তোমাকে
এবং এক-এক ক'রে তোমায় তখন দেখিয়েছি দ্বীপের কোথায় কী-যে,
কী-কী আছে গুণ,
কোথায় নতুন ঝর্ণা, খাতে নুনজল, সরেশ কোথায় জমি,
কোথায় সে বন্ধ্যা অনুর্বর।
এমন যে করেছিলো সে-ই আমি অভিশপ্ত হোক!
ব্যাঙাচি আরশোলা কিংবা বাদুড়ের সমস্ত তুকতাক
যা কিছু মন্তর জানে সিকারোক্স—
সব এসে বর্ষাক তোমার 'পরে।...
প্রসপেরো। ধিক ওরে সবচেয়ে মিথ্যুক গোলাম।
চাবুকের ঘা-ই তোকে নড়াবে হয়তো, কিন্তু নয় দয়া কোনোদিন।
মানুষী দয়ার বশে লালন করেছি,...
কত কষ্ট ক'রে তোকে কথা বলতে শিখিয়েছি,...
যখন জানতি না তুই, বন্য, তোর নিজের মানে কী—
বরং বক-বক করতি জন্তু যেন, আমি তোরই মনের ইচ্ছাকে
কথায় ভরেছি যাতে তুই স্পষ্ট জেনে নিস কী তোর ইচ্ছারা;

কিন্তু তোর কলঙ্কিত জাত...
তুই-যে পাথরে বন্দী, এ তোর উচিত প্রাপ্য ছিলো—
হাজত-গারদ থেকে আরো-বেশি প্রাপ্য ছিলো তোর।

১

উপরে উদ্ধৃত টুকরার অনুবাদক, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কে তিনি?

সব ভোলা গেলেও, বাঙালির স্মৃতিঔদাস্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খর এ কটাক্ষ একেবারেই অবিস্মরণীয়: 'এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী' ('বাঙ্গালার ইতিহাস', *বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ*, ১৮৯২)।

ওই আর্ষবচনের প্রকোপেই হয়তো, ক'জনের আর খেয়াল আছে, বিশ শতকের আটের দশকে এক সাময়িকীতে কিস্তির পর কিস্তি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন *ক্যালিবানের পৃথিবী* ধারাবাহিকী। তাতে ছিল, পাঁচের দশক থেকে ক্যালিবানি স্পর্ধা-ঔদ্ধত্যের হুতাশনে লাতিন আমেরিকায়, ক্যারিবিয়ান্সে, কাব্যে-উপন্যাসে যে boom/বিস্ফোরণ ঘটে, তার সানুপুঙ্খ বিবরণ।

বাংলা রূপান্তরে প্রসপেরোকে প্রদত্ত ওই যে ক্যালিবানের অভিসম্পাত, 'ব্যাঙাচি আরশোলা কিংবা বাদুড়ের সমস্ত তুকতাক/যা কিছু মন্তর জানে সিকারোক্স—/সব এসে বর্ষাক তোমার 'পরে', সেটি আছে ক্যারিবিয়ান সাহিত্যপরম্পরায় কীর্তিমন্ত ও অদ্যাবধি কীর্তিত দুই মহাকবি, বারবাডোস-এর

লেখক, সৌরীণ ভট্টাচার্য, রেবা ভট্টাচার্য, অমিয় দেব প্রমুখের সঙ্গে

এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপ সেন্ট লুসিয়া-র ডেরেক ওয়ালকট রচিত কাব্যমালার মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনূদিত চয়নিকায়, *স্তব্ধতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে: এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট ও ডেরেক ওয়ালকটের কবিতা* (১৯৯০)।

শুধু ব্রাফেট-ওয়ালকট কেন, হুয়ান রুলফো, নিকোলাস গ্যিয়েন, পাবলো নেরুদা, এর্নেস্তো কার্দেনাল, নিকানার পার্‌রা, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, ম্যানুয়েল পুইগ, মিগেল আন্‌হেল আস্তুরিয়াস, ওমেরো আরিদ্‌হিস, গাবরিয়েলা মিস্ত্রাল, হোর্সে লুই বোরহেজ, ওক্তাভিও পাস, কার্লোস ফুয়েন্তেস, আন্তোনিও স্কার্‌মেতা, মানলিও আর্গেতা, এরিয়েল ডর্ফমান, হোর্সে আমাদো, সেসার ভায়েহো, হুলিও কোর্তাসার—লাতিন আমেরিকার এমনতরো বহু মহারথীর সাহিত্যকৃতি বাংলা ভাষায় সুলভ আজ। এঁদের কেউ চিলে বা নিকারুগুয়া-র, কেউ, মেহিকো, কলম্বিয়া, গুয়েতামালা, এল সালভাদোর, আরহেনতিনা, ব্রাজিল বা পেরু-র। বিরাট এই সম্ভার যে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একাই গড়েছেন তা নয়। তবে, যেমন এর গরিষ্ঠভাগ তাঁর সৃষ্ট, তেমনি তাঁরই তাড়নায়-প্রেরণায় তর্জমা-যজ্ঞে অংশ নিতে বাধ্য-প্রবোধিত হয়েছেন অনেকানেক কবি-লেখক। কেবল লাতিন আমেরিকা নয়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য দেশ-মহাদেশের বহু কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-প্রাবন্ধিক-নাট্যকারকে একক উদ্যোগে ভরেছেন বাংলার ভাঁড়ারে। যথা: কুবার আলেহো কার্পেন্তিয়ের; মার্তিনিকের এমে সেজায়ের; পশ্চিম ইন্ডিস-এর স্যামুয়েল সেলভন; পোলান্ড-এর আইসাক বাসেভিস

সিঙার, চেশোয়াভ মিউস, ভিস্লাভা শিমবোর্স্কা, তাদেউশ রোশেভিচ, স্লাভোমির স্রোজেক, জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট, ইয়েশি হারাসিমোভিচ; চেকোশলভকিয়া-র কারেল চাপেক, ভাস্লাভ হাভেল; নাইজেরিয়া-র আমোস টুটুওলা, চিনুয়া আচেকে, ওলে সোইংকা; কেনিয়া-র এনগুগি ওয়া থিয়োংগো; ইংল্যান্ডের কোনান ডয়েল, এডওয়ার্ড লিয়ার, এডওয়ার্ড বন্‌ড; ফ্রান্সের জুল ভার্ন; জর্মান ভাষার রচয়িতা, বারটোল্ট ব্রেখট, হান্‌স মাগনুস এন্‌ৎসেন্‌সবার্‌গার, পেটার হান্‌ট্‌কে, পেটার বিকসেল, অডালবের্ট স্টিফটের; রাশিয়া-র বোরিস পাস্তেরনাক, আনা আখমাটোভা, ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি, আন্দ্রেই ভোজনেসেন্‌স্কি; মায়, বিশ্বসাহিত্যে কমিক-বৈভবের অগ্রনায়ক, গ্রিসের সুপ্রাচীন আরিস্তোফানেস। এবাদে আছে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা থেকে আহৃত মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজস্র উপহার।

বঙ্কিমচন্দ্রের *গীতা-ভাষ্য* (১৮৮৬-৮৮)ও অন্যান্য ভাবুকদের টীকাটিপ্পনীর সৌজন্যে, স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃবর্গের ভাবোচ্ছ্বাসের ঠেকারে, বঙ্গধামে ধার্য হয় *গীতা*-র ২/৪৭ শ্লোকটিই ক্ষীণায়তন গ্রন্থটির প্রাণভোমরা; সেই সহ রাজনৈতিক শ্লোগানে পর্যবসিত ২/৪৭-এর ছিপছিপে প্রথম পঙ্‌ক্তি, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, এবং বেজায় বাজার-চলতি, ছত্রটির ছিপছিপেতর অপানুবাদ, 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নাই'। সদ্য-আরম্ভ এই পরিকল্প/paradigm সরণ-বদলের কালবেলায়, ২৫ অক্টোবর ১৮৯৪, উক্ত অপানুবাদকে ভাঙিয়েই ফচকে মিচকেমিতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'ভগবদ্গীতায়

আছে কর্মেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নেই।... ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়' ('পত্র ১৬৯', *ছিন্নপত্রাবলী*)। তখনই অনেক ঠেকে, অনেক ঠকে, তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ, প্রসন্ন বিষণ্ণতায় মেনে নিয়েছিলেন, স্বদেশে যশ-স্বীকৃতি লাভের আশা, দুরাশা নয়, মোঘাশা। বাংলায় 'স্তব্ধতার সংস্কৃতি' যা নিরেট, যা জমাট চণ্ডীমণ্ডপী কুৎসাকৃপা, তাতে জীবনভর লেখালেখি ক'রেও উপেক্ষিত রয়ে যাওয়ার বঞ্চনা প্রচুর বাঙালির কপালে জুটেছে। 'স্তব্ধতার সংস্কৃতি'-র আরেক উৎপাত: কেউ যদি পাকেচক্রে বিশেষ কোনো সাহিত্যবর্গে অধিকারী ব'লে গণ্য হয়ে যান, ব্যস্, দেখতে হবে না, পাঠকবর্গ ওই খোপের কাটরাতেই আমরণ দাঁড় ক'রিয়ে রাখবে তাঁকে। খোপে ফেলে কোপের কূটনীতি/ slot and slaughter policy-র শিকার অনেকান্ত লেখকমাত্র হয়েছেন। এই যেমন, রবীন্দ্রনাথ; সেকালে যদি 'কবি', তবে, একালে শুধুই 'সুরকার'; চুলোয় গেল, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ছন্দের চাল, গদ্যের চলন নিয়ে অগুনতি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সমতুল দশা। অনুরাগী মহলে তিনি 'অনুবাদেন্দ্রনাথ' (ডাক)নামে পরিচিত। বাংলা ভাষার গ্রহণ-ধারণ শক্তিকে অনবরত জোরদার করার তাঁর যে ব্রতযাত্রা, তারই জেরে বোধহয় লোকে ভাবতেও পারে না, *অর্ধেক শিকারী*, *বাঁচাকাহিনী*, *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি*, *এই সময় শনির*, *চোরকাঁটা*-র মতো কাব্যগ্রন্থ, *চন্দ্রাহত*, *খেল-সমাচার*, *কানামাছি*-র মতো উপন্যাস, *ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস*, *রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য*, *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য*

সনদ, বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব-এর মতো প্রবন্ধগ্রন্থ, আখ্যানতত্ত্ব বিষয়ে সন্দর্ভ, ইত্যাদি আরও অনেক কিছুর প্রণেতা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুবাদেন্দ্রনাথ, রক্তমাংসে একই ব্যক্তি। ওঁরই কবিতার এককণা থেকে স্বচ্ছন্দে আদায় করা যায় বাঙালির বেড়ায়-বেড়ায় ভাগাভাগি ও অবদমন-অসাধ্য পৃথগন্ন-বৃত্তি বিষয়ে খাসা এ সুভাষিত: 'কত-যে দেয়াল আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই' ('*দেয়াল*', *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি*, ১৯৯৯)।

সন্দেহের ঊর্ধ্বে, বিদেশি কাব্যকে বাংলায় ঢেলে সাজাতে নিয়মিত মাত্রার ছন্দ অতিরিক্ত মুক্তবৃত্ত ও গদ্যকবিতা নিয়ে অনুবাদেন্দ্রনাথের সৎধীয়সী প্রয়াস-প্রযত্নে, জানুক না জানুক, মানুক না মানুক, প্রভূত উপকৃত বাংলার কবি-সম্প্রদায়। নমুনা হিসেবে রইল নিচে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও অনূদিত সঞ্চয়িতা এই স্বপ্ন! *এই গন্তব্য!: লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী কবিতা* (১৯৮৭) অন্তর্গত এল সালভাদোর-এর রোকে দাল্‌তোন রচিত 'OEA'-এর ('Organization of American States'-এর সংক্ষিপ্তরূপ) অনুবাদ—স্বাধীনতা-উত্তর ক্যালিবানের প্রসপেরো-সন্ধান ও সনাক্তির চমৎকার নিদর্শন 'OEA':

আমার দেশের প্রেসিডেন্টের নাম
এই মুহূর্তে কর্নেল ফিদেল সান্‌চেস্ হেরনাআনদেস্
কিন্তু জেনারেল সোমোসা, নিকারাগুয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট,
তিনিও আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট।
আর জেনারেল স্ট্রোসনার, পারাগুইয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট
তিনি একটু-একটু আমার দেশের প্রেসিডেন্ট
যদিও
অনদুরাসের প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ

জেনারেল লোপেস আরেয়্যানার চেয়ে কম,
আর হাইতির প্রেসিডেন্ট
মঁসিয় দ্যুভালিয়ের চাইতে বেশি।
আর মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
আমার দেশের সবচেয়ে-বেশি প্রেসিডেন্ট
আমার দেশের প্রেসিডেন্টের চেয়েও
যাঁর নাম—এই যে বললুম—এই মুহূর্তে
কর্নেল ফিদেল সান্‌চেস্ হেরনাআনদেস্।

২

১৯৮০। উমরে, ছাব্বিশে পা আমি। সতেরো থেকে পঁচিশ, নিয়মিত বই-পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি ক'রেছি বটে, তবে, বাছবাছাই আমার আনতাবড়ি। এমনসময়, কোন্ ঊনপঞ্চাশে বায়ুর দামাল উত্থানে কে জানে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে দরখাস্ত ঠুকি। চার-চার ঘণ্টার সাহিত্য ও সমাজ নিয়ে দুটি পত্র এবং তিন-তিন ঘণ্টার বাংলা ও ইংরেজির দুটি পত্রের কোশ্চেনে-কোশ্চোনে হাঁসফাঁসিয়ে, ঘন্টা এক আদালতি সওয়াল-জবাবে নাকানিচোবানি খেয়ে, লাভ করি অবশেষে, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রত্ব।

বিভাগে ঢুকে, আমি তো তাজ্জব! তিন বছর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের—কলেজ না ছাই, 'কলেজিয়েট স্কুল'—দমসম পরিবেশে কাটিয়ে ও তৎপর বছর সাড়ে তিন টিউশানি আর আড্ডায় বেকার জীবন বইয়ে, ধারণা হয়েছিল আমার, কলকাত্তাই বিদ্যায়তনিক পরিমণ্ডল বেজায় গুরুগম্ভীর, গিজগিজ করেন সেথায় আষাঢ়ে-বদন, রাশভারি পণ্ডিতেরা। ভুল ভাঙতে

দেরি হয় না। টের পাই অনতিবিলম্বে, লোকমুখে চালু রবীন্দ্র-নিরুক্তি, 'যাহার সব পণ্ড হইয়া গিয়াছে সে-ই পণ্ডিত', আদৌ বিদ্ধ-বিব্রত ক'রবে না আমায় তুলনামূলকে। কেননা, বিভাগের সকল অধ্যাপকই—সে তিনি নরেশ গুহ হোন বা অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরী বা দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বা ফাদার আঁতোয়ান, এবং অবশ্যই মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিজ-নিজ মর্জি অনুযায়ী প্রচণ্ড মজাড়ু। না, অন্তত তুলনামূলকে, ছাত্র-শিক্ষক মধ্যে দেয়ালের বাধা নেই—রবার্ট ফ্রস্ট-এর 'Mending Walls' কবিতায় ভারিক্কি মেজাজি প্রতিবেশীর প্রবাদে-উক্তি 'Good fences make good neighbours'-এর প্রতিক্রিয়ায় সেই যে বোধ হয়েছিল কবি-কথকের, 'Spring is the mischief in me', বাসন্তী ওই দুষ্টুমিতেই ভরপুর ওখানকার সব মাস্টার।

তুলনামূলকের গুরুমশাইদের সান্নিধ্যপ্রসাদেই অনেকটা ঘোচে আমার উচ্চশিক্ষাজগতের কুলীন বিদ্বানগণ সম্বন্ধে মজ্জাগত সসম্ভ্রম ত্রাস। ওঁদেরই সংসর্গগুণে আলাপ হয় ঠাট্টা-ইয়ারকি কুশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ আরও অধ্যাপকের সঙ্গে। এঁদের ক'জন: যাদবপুরে, অর্থনীতির সৌরীন ভট্টাচার্য, ইংরেজির যশোধরা বাগ্‌চী, মালিনী ভট্টাচার্য, সজ্‌নী (কৃপালিনী) মুখার্জি, বাংলার শঙ্খ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, প্রিন্টিং টেকনোলজির অশোক মুখোপাধ্যায়; কলকাতায়, মধ্যযুগীয় ইতিহাসের রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়; দিল্লিতে, ভারতীয় সাহিত্যের শিশিরকুমার দাশ; কল্যাণীতে, ইংরেজির তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়; ক্যানাডার

ইয়র্ক-এ, সমাজতত্ত্বের হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেকেরই নানান চুটকি ঠোঁটস্থ; প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবার চটজলদি ছড়া কাটতে ওস্তাদ। অনুমান, ১৯৬৭ সনে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির প্রাক্কালে বাঁধা মানববাবুর এ-ছড়া—অতুল্য ঘোষ-এর নেপথ্য-চালনায় উজল প্রফুল্ল সেন-এর শাসন-দেউটি নেববার স্বল্প আগে—বাস্তবিক অমর:

কে ফুললো?
প্রো ফুল্‌লো।
কে তুললো?
ও তুল্‌লো।

অধুনা চতুর্দিকে চাউর হলেও, পশ্চিম-নন্দিত প্রাচী-র কৃতিসন্তান, দীর্ঘদেহী সত্যজিৎ রায়-কে, মানববাবুই প্রথম বিভূষিত করেছিলেন Orient Longman খেতাবে। সুবীর রায়চৌধুরী ব'লেছিলেন একবার: 'কেতাবলোকের সাচ্চা নাগরিক মানব; অচ্ছা কোনো বই পড়লেই চোখে কেনে তিন কপি; এক, নিজের জন্যে; দুই, অন্যদের নাগরিকতার স্বাদ-নেশা ধরাতে ধারে বিলোতে; আর তিনেরটি, তখনকার current প্রিয়পাত্রকে উপহার দিতে'। একদা আমিও যে মানববাবুর প্রীতিভাজনদের তালিকাভুক্ত ছিলুম, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার বাড়িতে আজও গচ্ছিত উপহৃত তাঁর ঢের বই। সবেতেই মানববাবুর দান-বয়ান সমান—ওই সমত্বের পেছনে আছে আশ্চর্য এক সমাপতন। স্নাতকোত্তর বেকার-দশায় অঙ্কের টিউশানি ছিল আমার জীবিকা। তুলনামূলকে ভরতি হওয়ার মাস কয় যেতে-না-যেতে হাতে আসে সুবীর রায়চৌধুরীর কিশোর-উপন্যাস *গোলন্দাজ থেকে*

গোয়েন্দা (১৯৬৭)। পড়ে তো থ! সাল-গণনায় উপন্যাসটি যখন ছাপা হয়, আমি তখন ক্লাস সেভেনের পড়ুয়া। অথচ জলজ্যান্ত উপস্থিত তাতে জনৈক অঙ্কের মাস্টার, পোড়ো ছোঁড়াদের পেয়ারে ডাকবোলে নাম যার, 'শিবাজীবাবু স্যার'! এই অসম্ভবের কারণ কী শুধোলে, ঋষি-সুলভ রাহসিক হাস্য সহকারে ব'লেছিলেন সুবীরবাবু, 'আমি দেখেছি, আমার সব চরিত্রই পরে ছাত্র হয়ে ফিরে আসে'। এবার আর পায় কে মানববাবুকে। আমাকে প্রদত্ত তাঁর সমস্ত টোকনেই অবিকল এক inscription: 'শিবাজীবাবু স্যার জিন্দাবাদ—মা.ব.'।

মানববাবুর ঋণ-কল্যাণে কত-যে উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ হাতে আসে, সীমাসংখ্যা নেই তার। এদের একটি আবার বৈরাগ্যের ঘোর আলোড়ন জাগিয়েছিল আমার অন্তরপ্রদেশে—ব্রাজিলের হোর্সে আমাদো প্রণীত পর্তুগিজ উপন্যাস *The Two Deaths of Quincas Wateryell* (১৯৫৯)। পৃষ্ঠারাশির মানাঙ্কে পাৎলা হলেও, অভিঘাতে সুদূরপ্রসারী। বিষয়বস্তু তার, ব্যক্তিস্বভাবের তুরন্ত, আমূল কায়াপলট। ছিলেন ভালো Quincas Soares da Cunha—মাঝবয়সী, মৃদুভাষী, মাননীয়, মধ্যবিত্ত, মধ্যপদী সরকারি আধিকারিক; কোথায় ওই পঞ্চ ম-কারে ভোম হয়ে রইবেন, তা-না, হঠাৎ কোন্ পোকা নড়ল মাথায়, বউ আর মেয়েকে কুচুটে 'সর্পিণী' ও জামাইকে 'বোকা গাধা' গাল দিয়ে বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যান মিনমিনে আমলাটি। এবার তিনি শহরপ্রান্তের বস্তিতে, নিঃস্বত্ব, হাভাতেদের ভিড়ে; অনতিবিলম্বে নয়া Quincas, বোতল-বোতল রাম-পানের অনিঃশেষতায়, মস্তির নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায়, বস্তির বাসিন্দাদের তরফ

থেকে লাভ করেন শ্রদ্ধামন্ত দুই খেলাত, 'মোদোমাতালদের ছন্নছাড়া রাজা' ও 'কুলটাগণের কুলপতি'। এতেই ক্ষান্তি নেই, সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনায় Soares da Cunha পদবিটাও খসে যায় Quincas-এর—ভুল ক'রে একদিন সাদা রাম ভেবে সাদা জলে চুমুক মেরে 'Waaaaaater!' ব'লে ক্রোধে-আক্ষেপে যা চিলচিৎকার ছুড়েছিলেন, সেই রামপ্রণাদ যা হানা দিয়ে ফিরেছিল বসতির চকে-চত্বরে, তার ধাক্কায় Quincas-এর পদবি অচিরাৎ বদলে দাঁড়ায়, 'Wateryell'। সাংকেতিকতায় অতীব গহীন 'Wateryell', ঘরবিবাগী Quincas-এর থুথুৎকারময় 'নীর-নিকুচে' নাদ।

ঘেন্না ধরে যায় ম্যাড়ম্যাড়ে, মিয়োনো মধ্যবিত্ত যাপনে; আর না...

৩

আমার ছাত্রকালে তুলনামূলকের syllabus-এ পুরোদস্তুর ক্রিয়াশীল ছিল বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব বসু-র রুচি-প্রভাব—ছিল, শাখায়-উপশাখায় বহুধা বিস্তৃত ইউরোপীয় সাহিত্য, প্রাচীন গ্রিক-লাতিন এপিক-নাটক, সংস্কৃত কাব্য-মহাকাব্য আর প্রাগাধুনিক ও আধুনিক বাংলা। তখনও, প্রাক্তন উপনিবেশে কেমন হওয়া উচিত সাহিত্যের পঠনপাঠন সে বিষয়ে ১৯৬৮-তে কেনিয়া-র এনগুগি ওয়া থিয়োংগো-র নেতৃত্বে পরিগঠিত 'Nairobi Debate' তন্মাত্র দাগ কাটেনি ভারতের সবেধন তুলনামূলক বিভাগের পাঠক্রমে। তা-ও, 'প্রাসঙ্গিকতা'-র পরিপ্রশ্নে এনগুগি-র খোঁজ-নিবন্ধ 'The Quest for Relevance'-এ (*Decolonizing the Mind: The Politics of*

লেখক, সৌরীণ ভট্টাচার্য, অমিয় দেব প্রমুখের সঙ্গে

Language in African Literature) দাখিল প্রস্তাবের খুব কাছাকাছি ছিল মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরীর অভিমত—ওঁদেরই চাপাচাপিতে আমার পরের বর্ষে, সিলেবাসে বাংলার পাশাপাশি ঠাঁই পায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য। আরও ক-বৎসর লাগে, দুয়ারে ঠায় দণ্ডায়মান, অপেক্ষমাণ, আফ্রিকী-লাতিন আমেরিকি-ক্যারিবিয়ান্স-এর প্রবেশ-আর্জি গ্রাহ্য হতে।

অবশ্যি, মস্ত এক ব্যতিক্রমও ছিল—১৯৮২ সনে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত, জাদু-বাস্তবতার কথাকার গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর *One Hundred Years of Solitude* (১৯৬৭), ১৯৮২-র ঢের আগেই মানববাবুর গা জোরাজুরিতে তুলনামূলকের পাঠ্যসূচিতে অধিগৃহীত; অক্ষত কাটে তাতে আমাদের 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'।

তবে, বর্জিত যে, অবহেলিত, সদরপথে ঢোকা বারণ যার, তার খাতিরে খিড়কির পথটা তো আলতো-সে খোলা যায়—রাজনীতির পরিভাষায়, ঘুররাস্তায় সারা ওই খাতিরদারি, 'অন্তর্ঘাত'।

'আধুনিক পশ্চিমি উপন্যাস' নিয়ে একশো নম্বরের পেপার ছিল আমাদের। খুঁটিয়ে পড়তে হতো আট-আটটি ঢাউস নভেল—ইঙ্গ-তর্জমায় বা মূলে, মিগুয়েল দ্যে সারভান্তাস-এর *Don Quixote*, জেন অস্টিন-এর *Emma*, স্তাঁদাল-এর *Red and Black*, গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর *Madam Bovary*, চার্লস ডিকেন্স-এর *Hard Times*, লিও টলস্টয়-এর *Anna Karenina*,

ফিয়োদর দস্তভয়েস্কির-র *The Possessed*/*The Devils*, মার্ক টোয়েন-এর *Adventures of Huckleberry Finn*। এদের মধ্যে মানববাবুর দায়ভারে ছিল, *Emma*, *Red and Black*, *Anna Karenina*, *Huckleberry Finn*। কৈশোরে যাঁর জুল ভার্ন-শার্লক হোমস্ অনুবাদ ছিল আমার প্রিয় দুই সাথী, তাঁর সাথে ওই ক্লাশঘরেই আমার সত্যিকারের পয়লা মোলাকাত—মার্কসীয় শ্মশ্রুতে সমাচ্ছন্ন, উড্ডুট্টে ছাপছোপে ফকির-মার্কা মুশকিল-আসানি জোব্বা পরিহিত টিচার! আর, তাঁর বিদ্যা-বিতরণের তরিকা?

দশ মিনিট কম এক ঘণ্টার ক্লাস আমাদের—আর, মানববাবু কি-না গোড়ার তিন-তিন ক্লাশ ঝাড়া পঞ্চাশ মিনিট নিশ্চুপ! বক্তৃতার বকলমে, দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ফাঁকে সাদা চক, বাম করে ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ডে ঝড়ের বেগে খসখসিয়ে লিখে চলেছেন পুস্তকতালিকা! লেখক, ভাষা, দেশ, বইয়ের নাম ও প্রকাশসনের পারম্পর্যে গাঁথা সে-তালিকা এত দ্রুত লেখা ও মোছা হচ্ছে, যে, তা টুকতে 'বুঝভুস্থুল' 'টরেটম্' দশা আমাদের। তিন খেপে 'চিক্‌চাকস্ আমদানি' হয় ভারতীয়, আফ্রিকী ও লাতিন আমেরিকী উপন্যাসের লম্বা-সে-লম্বা ফিরিস্তি।

অপশিক্ষার বাবদে ইউরোকেন্দ্রিকতার মায়াডোরে বাঁধা ভদ্রলোকী মস্তক; কঠিন সে বাঁধনকে ফসকা গেরোয়-গেরোয় আলগা করার উদ্দেশ্যেই মানববাবুর পশ্চিমা নভেলাচোলনার মুখপাতে নির্বাক জানান—উপন্যাস বস্তুটির উপর West-এর মৌরসিপাট্টার প্রচলিত ধারণাটি নেহাত ধাপ্পা। এরেই কয়

ক্যালিবানি রণকৌশল; 'decolonizing the mind'-এর চোরা আকাঙ্ক্ষায়, গেরিলা আক্রমণ।

পাঠক্রমে, 'শিশু'-'প্রেম'-'মৃত্যু', তিন থীম-এ বিন্যস্ত ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। শিক্ষক: মানববাবু। শুরু 'শিশু'-তে। ক্লাশে এসেই মার্কস্‌বাদী কবির সে-কী তর্জন-ভর্ৎসন। রবীন্দ্রনাথকে তুলোধোনা করত বোঝান, বাঙালির ভবিষ্যৎ যে নিবিড়কৃষ্ণ আঁধার, আগামী সে অনুত্তরণীয় তমসের জন্য একশো শতাংশ দায়ী ওই দেড়েল—ভাবখানা যেন, নিষ্কারণ তাঁর মসি লেপনে-লেপনে বাংলাভাষীদের ঘিরেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'সবার দিঠি এড়ায়ে' অনারোগ্য 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে'! জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সহমত, তবু হতভাগ্যের অতীতকে একফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়াটা বড় বেদনার মতো বাজে বুকে। এর আগে এলোমেলো যেটুকু যা পড়েছি, তাথেকে আমা-মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিই সঞ্চারিত হয়েছিল মৃত্যু-সম অমোঘ দুর্বার প্রেম। উত্তাল রবি-বিদূষণে মর্মাহত, জ্ঞাপন করি ভয়-কম্প্র মৃদু আপত্তি। উত্তর মেলে না। যা-ই হোক, চুকলে, অক্ষরশই যা 'মুখবন্ধ', আরম্ভ হয় মানববাবুর *শিশু*-র কবিতাপাঠ। লক্ষ না করে পারি না, যত এগোয় আবৃত্তি, তত ধরে আসে গলা, 'গহন' কোনো 'মোহে'র দরুনই হবে, উত্তরোত্তর দ্রাব, কাঁপোকাঁপো স্বর। শেষের কবিতাটি ছিল *শিশু*-র 'জন্মকথা'। তার প্রথম স্তবক, 'খোকা মাকে শুধায় ডেকে—/"এলেম আমি কোথা থেকে,/কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"/মা শুনে কয় হেসে কেঁদে/খোকারে তার বুকে বেঁধে—/"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে"।', খতম হতে-না-

হতে মানববাবু নিজেই যেন খতম, কাব্যিক গজবে, Kafkaesque কোন্ metamorphosis-এ, অন্য মানুষ। অতঃপর, নাটকীয় প্রস্থান; আর, সে-কী exit-line: 'আমরা এখানে বলতে বাধ্য হই, রবীন্দ্রনাথ চমৎকার কাজ ক'রেছেন'!

তখন ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে; মাঝেমধ্যে যাই মানববাবুর বাড়ি; বসি, বইয়ে ঠাসা তাঁর ছোট্টো ঘরে, আবারও বইয়ে ঠাসা তাঁর বিছানার একধারে। মনে আছে, সেদিন ছিল সরস্বতী পুজো। গিয়ে হেরি, ভালোই রসেবশে তিনি। ওরই অসরে, সহায়ে নিশ্চয়, তদবধি আমার মুখ-নিঃসৃত যত-যা রবিকীর্তন 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত' ছিল ওঁর চিদ্‌কোণে, রুদ্ধশ্বাস সে-মেঘের আকস্মিক বিস্ফোটে, তেড়েফুঁড়ে ওঠেন মানববাবু: 'তুমি এত রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ করো কেন বলো তো? রবীন্দ্রনাথ আমার, আমার। উনিই সব দিয়েছেন আমাদের। তুমি কোথাকার কে?'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগ-অনুরাগ, কটু-মধুর গ্রন্থিজটিলতার মনোহর আখ্যান, *চন্দ্রাহত* (১৯৯৮)। বিযুক্ত তবু যুক্ত দশটি পরিচ্ছেদের সমবায় মানববাবুর *চন্দ্রাহত* উপন্যাস; তার আদি পরিচ্ছেদ, 'চাঁদের বন্দনা'। আঙ্গিকে আত্মজৈবনিক, 'চাঁদের বন্দনা'-র শিরোনাম-তলে উৎকলিত বার্তা: "['সমান্তর' সাহিত্যপত্রে অধীর মজুমদারের শেষ প্রকাশিত গল্প']"; এবং, পরিচ্ছেদ-অন্তে অধীর মজুমদারের মন্তব্য: "...গল্পটাকে একেবারে নতুন ক'রে ঢেলে সাজাতে হবে। বিশ্রী একটা ঘোরের মধ্যে লিখেছিলাম...ঠিক ভূতের গল্প তো আর লিখতে চাইনি"।

বাসাবদল ক'রছে কথাকার। আর-এক দিনে পুরোনো বাড়ি ছেড়ে যাবে— বিদায়-বিধুর ক্ষণে প্রায় খালি তার বাসি-হয়ে-এল আবাসে ভূতাবেশেই যেন ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে সে। লোকটি সম্বন্ধে জনরব: "সামাজিক কর্তব্য ও ধকল সামলাতে পারে না ব'লে কূপের মধ্যকার কণ্ডুপের মতো নিজের ছোট্টো ঘরটাকেই ভালোবাসে" সে। তবে, কথকের ভাবচরিতে স্পষ্ট, তার ক্ষেত্রে 'কুনো', 'মুখচোরা' বিশেষণ খাটলেও, আদৌ 'কুঁড়ে' নয় সে, কূপমণ্ডুক তো নয়ই। আচ্ছন্নতার ঘোরে এধারে-ওধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টুকিটাকি, প্রয়োজনে অবান্তর আবর্জনাবৎ জিনিস-টিনিস নাড়তে-চাড়তে নিজেই কবুল করে কথাকার: না, মোটেও 'পরিশ্রমবিমুখ' নয় সে; "দিনরাত না-খাটলে, গাধার মতো না-খাটলে...কিছুতেই তার চলে না", "স্বভাবটা" যে তার "ঠিক কুলির মতো"।

"শেষ রবিরেখা মিলিয়ে গিয়ে নীল ঘুমের মতো সন্ধে নেমে" এলে, স্যুটকেশে ভ'রে নেয় কথক, দেয়ালে ঝুলন্ত দুই ছবি। এদের একটি জনৈক কবির ফটো। বিড়বিড়োয় আপনমনে: ওই "কবিকে সে এত ভালোবাসে যে ভীষণ অপছন্দ করে"। এ-ও স্বীকার করে, তার জীবনে কবিমশায় অর্ধেক শিকারী সম; কারণ, হাস্যকর ধারণা তার, "ঐ কবিই তাকে তলে-তলে হত্যা করার ফিকিরে ছিলেন; কিন্তু তাঁর গানের সামনে বড্ড অসহায় হ'য়ে পড়ে সে সর্বদা"। ভালোবাসা-অভালোবাসার টানাপোড়েনে যত-না রক্তাক্ত, দ্বিধায়-দ্বিধায় বিভক্ত হোক কথক, কবির ফটোখান নতুন বাসায় নিয়ে যেতে ভোলে না—নইলে যে অসহায়তায় রিক্ত, আর এগোবে না চন্দ্রাহতের বাঁচাকাহিনী।

লেখকের সঙ্গে

বলার অপেক্ষা রাখে না, উক্ত কবি, রবীন্দ্রনাথ।

৪

বয়স ছাব্বিশ; তা-ও, ওই কাঁচা বয়সেই অনপনেয় এক পিছুটানের আবেশে মুহ্যমান। 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' বা 'From Roy to Ray', অনুপ্রাসের ঝাঁকিতে যে ধারাবহেই সাজাই ইতিবৃত্ত, বঙ্গীয় রেনেসাঁস-এর মহিমা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ আমি। খুচখাচ সংশয় সত্ত্বেও, গড্ডলিকাবৃত্তিতে সর্বগ্রাহ্য, নিটোল, নির্ভার, মসৃণ ওই আখ্যায়িকাই তখন আমার consciousness/ চৈতন্য-এ প্রজ্জ্বলন্ত। অস্পষ্ট তবু উলটো-ঝোঁকের যে-সব কথা preconscious/প্রাকচেতনা-য় জমা হয়ে বলি-বলি ক'রতে চাইছে, তুলনামূলকে না এলে, সেগুলি প্রকাশসংহতি পেত কি-না সন্দেহ। কোথাও যেন খটাখটি, অন্তর্বিরোধ নেই, বাংলার আধুনিকতার গায়েনগণ হাতে-হাত ধরে, দৈবের ঘোরে, একমেটে একটি গপ্পই সাতকাহন ক'রে গেছেন—নির্বোধ এ কষ্টকল্পনায় আমি যে অভিভূত তা বোঝাতে সুবীর রায়চৌধুরীর ঝাড়-বিদ্রূপে প্রবল নাড়া খায় আমার preconscious, ঝরতে থাকে নতুন শব্দমুকুল। নির্মম সেই ঝড়ে তো বটেই, সৌরীন ভট্টাচার্য, সুবীর রায়চৌধুরী, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিত্য ওঠা-বসায় ক্রমশ গোচরে আসে সে-যাবৎ অগোচর অনেককিছু। পড়তে আরম্ভ করি, কার্ল মার্কস্ রচনাবলি; জানি, ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি প্রযোজিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বদৌলতে, দেশবাসী হয়েও পরবাসী, অনুপস্থিত জমিদারদের রায়ত-সম্প্রদায়ের উপর নিষ্কারণ নিষ্করুণ লাঞ্ছনার ইতিহাস, ভূমিস্বত্বের মামলায়

কম্পানির খয়রাতে অন্তর্লীন ছিল কোন্ অর্থনৈতিক কুযুক্তি; আরও জানি, তথাকথিত স্বদেশের প্রসপেরোকুল, জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্যালিবান-সমান রায়তদের উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বিদ্রোহের উত্তপ্তকথা।

১৯৮২। ভেতরে-ভেতরে তুমুল ভাঙাগড়া চলছে; এমনসময়, আদেশ আসে সুবীর রায়চৌধুরীর, আমি যেন *হরবোলা* 'পর আলোচনা লিখে যথাশীঘ্রং উপস্থিত করি ওঁর কাছে। ব্যাপার কী! *হরবোলা* নামক দু-খণ্ডের কিশোর-সঞ্চয়ন প্রস্তুত ক'রেছেন মানববাবু—লাতিন আমেরিকান, আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান্স, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপীয়ান সাহিত্যিকদের নানান কবিতা-গল্প-নাটিকা-উপন্যাসিকার বঙ্গানুবাদের সংগ্রহ; এবং, সম্পাদক যেহেতু মানববাবু, বইদুটির বস্তুসম্পদ আদৌ মধ্যবর্গীয় বাঙালির যৌন-ন্যাকামিতে, ছেলেমেয়েদের অকালে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার অভিভাবকী যৌন-শঙ্কায় বিড়ম্বিত নয়।

যত পড়ি *হরবোলা*, যত লিখি তা নিয়ে, ততই খুলতে থাকে মনের আবজানো জানলা-ঝরোকা। সমাপ্ত হলে প্রবন্ধ, ফের সুবীর রায়চৌধুরীর আদেশে, জমা দিই সেটি *বারোমাস* পত্রিকার দপ্তরে। পরের মাসে বেরোয়ও তা—আমার দীর্ঘ সাতাশে-পা জীবনে ওই আমার দ্বিতীয় ছাপিত নিবন্ধ। তবে, নামকরণটি *বারোমাস*-সম্পাদক, অশোক সেন-এর—'সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কিশোরসাহিত্য'।

ছিল, রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, ১৯৬০-৬১-তে রচিত মানববাবুর বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন, *রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য* (১৯৭০); নিয়ত ঋদ্ধ হচ্ছিল, মানববাবুর অফুর জোগানে,

অ-পশ্চিমি সাহিত্য সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা; এল, *হরবোলা*-র সাজসে ‘সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কিশোরসাহিত্য’। এদেরই পথনির্দেশে বছর কয় পর, মনোনিবেশ করি বাংলা শিশুসাহিত্যে; ছকবার চেষ্টা করি, কোন্ উপাদানে, কোন্ উপায়ে, পরিগঠিত হয়েছে সেখানে, এরিয়েল-ক্যালিবান দ্বন্দ্বসমাস।

পুনশ্চ

স্মরণশক্তি প্রবল, এমন অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে। কিন্তু, এ-ক্ষেত্রেও, আমার মতে, অদ্বিতীয় মানববাবু। সচরাচর যা হয় না, ভাষিক এবং দৃক, দু-ধরনের স্মৃতিই তাঁর অলৌকিক। বহু-বহু চলচ্চিত্রের— যথা, ইংমার বার্গমান-এর *The Seventh Seal* (১৯৫৭)—শট ধরে-ধরে বিবৃতি, নয়ের দশকেও, মানববাবুর কাছ থেকে হাঁ হয়ে শুনেছি। তাই ব’লে কি ভোলা যায়...

হাজার ঢুঁড়লেও ‘মাকোন্দো’ নামক জনপদটির খোঁজ কোনো ম্যাপে মিলবে না; আছে সেটি স্রেফ গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর *One Hundred Years of Solitude* উপন্যাসের পাতায়; তা সেই কল্প-অঞ্চল একবার আক্রান্ত হয় মারাত্মক অনিদ্রারোগে; ওই মহামারীর জেরেই মাকোন্দো-র জনগণ গ্রস্ত হয় স্মৃতিভ্রংশতার রোগে; এমন দুর্মর সে ব্যাধি যে খুব শিগগিরই লোকের মাথা থেকে একে-একে মুছতে থাকে শব্দ, শব্দের অর্থ, হরফ সংক্রান্ত বোধ; অপরিচয়ে-অপরিচয়ে ছিন্নভিন্ন মাকোন্দো।

নয়া-ঔপনিবেশিক দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর ‘নোবেল পুরস্কার ভাষণ’-এ ব’লেছিলেন গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস: ‘এস্পেনিয়ার অধীনতা থেকে মুক্তিলাভও কিন্তু অস্থির বিকার থেকে রেহাই

দেয়নি আমাদের' (*বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব*)। মাকোন্দো যে যাবৎ ঔপনিবেশিক দেশসমাজের অণুবিশ্ব, 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা'-য় ভোগান্তির স্মারক, তার প্রমাণ প্রকীর্ণ সর্বত্র। এই যেমন পশ্চিমবঙ্গ। অস্থিরতার বিকারে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে সেখানে এখন, বিশেষ, উঁচশিক্ষার তিলকধারী-অধ্যুষিত উপরতলায়, বাংলা-ভুলো অপস্মার-অধ্যায়—খইছে অনন্তর শব্দ, শব্দের অর্থ, জাগছে বঙ্গলিপির সার্থকতা নিয়ে সংশয়। মন্দের ভালো, *One Hundred Years of Solitude*-এ, মাকোন্দো-র ভাষাবিস্মৃতির করালবেলায়, জনৈক ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক মমতায় লিখে রেখেছিলেন মড়ক-ধ্বস্ত জনপদটির কাহন। অনেক, অনেক বৎসর পর আবিষ্কৃত হয় তাঁর সে খতিয়ান। লেখা হয়েছিল তা, ইস্পানিতে নয়, সংস্কৃতে!

সুতরাং, প্রায় অপঘাতে মৃত ভাষার ছমছমে ভৌতিক পরিবেশে, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেন "দিনরাত গাধার মতো" খাটা স্মৃতিদীপ বাকশ্রমিককে চলতে হলে, চলতে হবে একা—বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে জ্বলতে হবে একলা।

আলোকচিত্র সৌজন্য: মৈনাক বিশ্বাস

প্রকাশ: *মানবেন্দ্র ২০১৮: আশি বছর বয়সে বন্ধুদের শুভেচ্ছা*, সংকলন ও সম্পাদনা: তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মার্চ ২০১৯

অভিজিৎ রায়

এইখানে, এক্ষুণি... অথবা অনির্দেশ্য: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

নিতান্তই পাঠক যিনি, কবিতা ধরে ধরে কাটাছেঁড়া করার অভ্যেস বা তাগিদ, কোনোটাই যাঁর নেই, তাকে দিয়ে যখন কবিতা বিষয়ে লেখাতে চান সম্পাদক, তখন বুঝতে হবে ঠিক 'সমালোচক'-এর দৃষ্টিভঙ্গিটা এই দফায় চাইছেন না তিনি। ব্যাপারটা অভিনব হতে পারে সন্দেহ নেই। অবসরের আনন্দে পড়েন, বিচিত্র অনুষঙ্গে নিজেকে হারানো আর খোঁজার হাতছানিতে কবিতার ফাঁদে পড়েন, কিংবা হয়তো যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে জীবন আর তার চারপাশটাকে বোঝার নানান ফিকির জুটে যায় বলেই পড়েন— এমন মানুষের সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। কিন্তু এঁরা শুধুই

পড়েন, কবিতা দু-একখানা লেখার চেষ্টা করলেও, সে বিষয়ে লেখার কথা ভাবেন না কখনো, সমালোচনার পক্ষে সত্যি জরুরি যে পাণ্ডিত্য তা নেই বলেই। এঁদের দিয়ে লেখালে, ধরা যাক নিছক স্বাদবদলের জন্যই, যেটা হতে পারে তা হল সমালোচনার প্রথাগত বৃত্তের বাইরেও যে নিভৃত অভিনিবেশের একটা পরিসর আছে, তা টের পাওয়া যায়। সত্যি কথা বলতে কী, 'নিভৃতি' এবং 'অভিনিবেশ', সবরকমের কবিতার না হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা 'আধুনিক' কবিতার পাঠ-প্রক্রিয়ার এবং পাঠ-মুহূর্তের শর্ত বিশেষ। কবিতার সঙ্গে এ দুয়ের যোগ অন্যান্য সাহিত্য-আঙ্গিকের চেয়ে বেশি কি না, তা গবেষকেরা বলবেন। তবে এই কোলাহল আর দ্রুতজীবনের যুগে, যখন গতিবেগ এবং সপ্রতিভতা সমানুপাতিক সম্পর্কে জোড়া, নির্জনতা এবং আয়েসী ভাবনার সূচক হিসেবে কবিতার মুহূর্তটির উপনিবেশ কবিতার কারবারিদের বাইরে কতদূর ছড়ানো, তা দেখা বেশ উপভোগ্যই হতে পারে। মামুলি পাঠকের হাতে কলম ধরালে খেলুড়ের হাত থেকে দর্শকের দখলে চলে আসে কবিতার সার্কাস রিং—আর তক্ষুনি তো পা পিছলে আলুর দম হবার সম্ভাবনা, পদে পদে হাসির খোরাক! শুধু মনে রাখতে হবে দর্শক ঠিক আবার খেলচত্বরের বাইরেরও কেউ নন। হাততালি আর টিটকিরি ছাড়া কি কোনো নৌটংকি জমে? ঠিক যেমন বিরলে কবিতা পাঠ (বা যে-কানো ব্যক্তিক মোকাবিলাকে) সোজাসাপটা বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের পরিসরে ফেলতে হবে তার কোনো মানে নেই; কোলাহলই তৈরি করে তাকে আবার সে-ও দেখতে-শুনতে পায়, সে-ই নির্মাণ করে সমষ্টির কলরোল।

প্রসঙ্গটা ঠিক গুছিয়ে তৈরি করা গেল না, দরকারই-বা কী? সাংকেতিকতা কি শুধু একটা প্রকরণ মাত্র? বক্তব্যেরই অংশ নয় কি সেটা? তবে প্রসঙ্গটা জরুরি কারণ আমরা এখন যে কবিতার মিছিলের মুখোমুখি হব, তা ভিতর-বাহিরের সম্পর্কটা নতুন করে পড়তে চায় নিরন্তর। ইচ্ছে করেই খানিকটা গুলিয়ে দিতে চায় বলে মনে হয়: 'স্রোত যেখানে ক্ষিপ্ত, জটিল, আবর্তমান,/জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে কে সেখানে?/ তুমি! এ কী! তুমি কোথায়? আমার পাশে/এতক্ষণ যে সাঁতার দিল তীরের আশায়/ সে তবে কে? অলীক মায়া? দৈব? ছায়া?/ প্রতিধ্বনি হারিয়ে গেল; ভয়ে ভয়ে/স্বপ্ন তাকায় জলের দিকে; আকাশ খসায়/ তারাবাতির ফুলকি; নিখিল ঘূর্ণি হাসে!' সীমান্ত ঘোলাটে হয়ে ওঠার এমন চোরা-ইঙ্গিত অনেক কবিতাতেই রয়েছে। এই কবিতাটির নাম তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে 'দিনান্ত' (পৃ: ৩০)।

১৯৫৬ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে কবিতা লিখছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। *অর্ধেক শিকারী* (১৯৭৪), *বাঁচাকাহিনী* (১৯৭৬), *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি* (১৯৯৯), *এই সময় শনির* (২০০৩)—এই চারটি বই এবং কিছু অগ্রন্থিত কবিতা নিয়ে ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে বেরিয়েছে আমাদের আলোচ্য *কবিতাসংগ্রহ* (প্রকাশক: দে'জ)। সংগ্রহ, সমগ্র, শ্রেষ্ঠকবিতা—এই ধরনের সংকলন নিয়ে পাঠকমহলের নানান অনুযোগ প্রায়শই শোনা যায়। একটি কাব্যগ্রন্থ যেভাবে নিজেকে সাজিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয়, তা অনেকটাই হারিয়ে যায় বড়ো সংকলনে। যেমন *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি*-তে দেবব্রত ঘোষের করা প্রচ্ছদ: লুডোর ছকে বইনামের হরফগুলো ঘেঁটেগুলে একশা হয়।

মইগুলো নেতিয়ে থাকে, কিন্তু চার-চারটে সাপ চোখ পাকিয়ে গিলতে আসে উন্নতিকামী মধ্যবিত্তকে; কালো থেকে ফিকে হলুদ আলোকিত ছোটো আয়তক্ষেত্রটির ভেতর ঢুকতে চাওয়া বা বাড়ি করে থিতু হতে চাওয়া লোকটির কাজ নেহাৎ সহজ নয়। এরকম একটা গল্প-বলা তির্যক প্রচ্ছদ বা গোটা বই জুড়ে দুর্দান্ত রেখাচিত্র *কবিতাসংগ্রহ*-এ পাই না। সংকলনে কবিতার সঙ্গে জোরদার উপস্থিতি থাকে কবিরও। সংকলন হয়ে ওঠে অন্যরকমের পাঠ-পরিসর। যখন কবির গোটা কাজকে দু-মলাটের মধ্যে আনি, তখন শুধু 'author' অর্থে নয়, কবিতাভাবনার একটা যাত্রা প্রতীয়মান হয়, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে শিল্পীজীবনের অবস্থানটি বোঝার একটা সুযোগ হয়। এ ঠিক ব্যক্তির নয়, সমষ্টি আর ব্যক্তির একে অপরকে নির্মাণ করার গল্প, বা কবিতা-ই। |

'যাত্রা' কথাটা অনর্থক নয়। বিশেষ করে এই সংকলনে দেখছি মূল বইগুলির সজ্জা প্রায় অপরিবর্তিত রেখে, রক্ষিত হয়েছে লেখার সময়কালের এবং বইপ্রকাশের ক্রমটিও। অর্থাৎ বইগুলি আবার ফিরে পড়ার সুযোগ হয় তো বটেই; একই সঙ্গে শুরু থেকে পড়লে কবি জীবনের সঙ্গে বেড়ে ওঠার একটা অনুভূতি হয়। তবে এক একটি বইয়ের ভিতর সময়ের ক্রম নয়, প্রধান হয়ে উঠেছে অনুষঙ্গের প্রবাহ। কবিতার সজ্জা এবং ক্রম নিয়ে সযত্ন ভাবনা যে কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে, তার এক চমৎকার উদাহরণ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটি বই। *অর্ধেক শিকারি* (রচনা: ১৯৫৬-১৯৬৩) তিনটি ভাগে বিভক্ত: 'প্রথম দেখা', 'বিচ্ছেদ' এবং 'উপদ্রুত উপত্যকা'। নামের মধ্য দিয়ে যে আখ্যানটি বেরিয়ে

আসছে, তার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ প্রথম অংশটিতেই ('প্রথম দেখা') রয়েছে। প্রথম দিকের কয়েকটিকে 'প্রেমের কবিতা' বলব কি না জানি না, তবে সে-সব প্রেমিক-সত্তার উচ্চারণ নিশ্চিত। 'তুমি' সম্বোধন ঘুরেফিরে আসে এই পর্যায়ে। আর প্রেম এখানে মোটেই ম্যাড়ম্যাড়ে রুটিন-বাঁধা নয়। মারাত্মক উত্তেজনা আর রক্তের ছলকানিতে টগবগিয়ে ওঠা ছ-মাত্রার কলাবৃত্তে কথা বলে প্রেম। 'প্রথম দেখা' নামপত্রের কবিতায় যেমন: 'বেলা তিনটেয় লাফিয়ে উঠলো রক্ত/ হাওয়া দিলো যেই চৈত্রের বনে-বনে/ মোহিত মদির প্রণত সমর্পনে—/ অমনি কেবল স্বতস্ফূর্ত মুক্ত গন্ধ ছড়ালো অনন্ত অঙ্গনে।' (পৃ: ১৫)। প্রেম না প্রসব? অন্ধ জঠর থেকে বেরিয়ে রোশনিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল কি? 'প্রথম দেখা' থেকে 'Oh, My Love is like a...', 'সারা রাত তুমি' হয়ে 'সিসেম, দুয়ার খোলো' পর্যন্ত চাওয়া-পাওয়ার দোলায় আশায় দুলতে থাকে কথক, স্মৃতির মতো হলেও প্রেম ছেড়ে যায় না। 'যেন ক্ষুধা' কবিতাটির থেকে স্মৃতি হয়ে ওঠে ভার, একলা নির্জনের বোধটা যেন চেপে বসতে চায়: শুধু থাকে স্মৃতির প্রহার,/ স্মৃতি, আর নিরুত্তাপ শব।' (পৃ: ২০)। 'সবকিছু কেড়ে নিলো—অন্ধকার ক্লান্ত অবসর,/ গোলাপ গানের সুর, বিস্মৃতির কবচকুণ্ডল।', যদিও প্রতীক্ষার শেষ হয়নি: 'লৌকিক যুক্তি জাল অকস্মাৎ ছিঁড়ে ফেলে যদি সমস্ত ভুবন জুড়ে বেজে ওঠে তার টেলিফোন!' ('তাহলে, দয়ার ছলে', পৃ: ২১)। এই অংশে 'উদ্ধার' কবিতাটি থেকে বাঁকবদল: পংক্তি দীর্ঘতর হয়, আসতে থাকে প্রবহমান পয়ারের রূপ, জঞ্জাল ফুঁড়ে সবুজ প্রাণের উদগম বহুমাত্রিক জীবনের রূপকে উড়ান দেয়: 'কোথাও

গোপনে তবু বদ্ধ মূল আলোকের ফুল/ না-রেখে দ্বিতীয় অর্থ ডাক দেয় আসক্ত, নির্ভুল:/তিক্তের বলয় ফেটে গাছ ফোটে;..' (পৃ:২৪)। এই কবিতাটিতে ১/৪ এবং ২/৩-এর অন্ত্যমিল আশার চক্রাকার উদ্ভাসকে ('কেননা ঝিনুক যেই মরে যায়, মুক্তো ফোটে ঠিক মাপে মাপে') ধরে রাখতে সাহায্য করে। এর পরের কবিতাটি ('য পলায়তি') এবং আরো বেশ কয়েকটিতে মিল তীব্র হয়, না হলেও ছন্দ অনেক টানটান। কথক যেন খানিকটা disengaged হয়ে চারপাশের পৃথিবীটা দেখতে পায়: 'কেমন যেন হঠাৎ বদলে যায়/ ট্রামের হাতল, মিলন, কি বিচ্ছেদ। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া কেউ, ঘুমের ওষুধ, খেলা, আপিশ, খেদ'। ('যে পালায়', পৃ: ২৬) কিংবা এসপ্লানেডে কলেজ স্ট্রিটে দড়ির খেলা দেখার অনুষঙ্গে 'যারা পালায় তারাই বাঁচে/ হোক যা-খুশী-সঙ বা বোকা।/ হাততালি পায় একশো লোকের।/ একলাফে তুই পালাতে চাস?' ('যারা পালায়', পৃ: ২৬)। এই তিনটি কবিতা পলায়নের থীম নিয়ে একটা অণু-সিরিজ বলা যায়। আত্মগত প্রেম থেকে বেরিয়ে একধরনের দৈনন্দিন ছন্দে প্রবেশ ঘটে: 'শব্দেরা সব কেনা গোলাম, যা-খুশী তাই করতে পারে।/ বুকের মধ্যে ধুকধুকি আর চাকরি বজায় থাকলে কারে/ একলা ঘরে মিথ্যে ডরাই—আমার ভালো অন্ধকারেই।' ('য পলায়তি', পৃ: ২৫)। আর তাই হয়তো নতুন করে সম্ভব হয় প্রেম, তবে এখন তা ঠিক আগের মতো হতে পারে না: 'প্রত্যাশারও অধিকতর দান পেয়েছি বসন্তেরই—/বড় লাগে অপ্রতিভ: তোমায় নেবো কেমন করে?/ সৌন্দর্যের গোপন নাম যে আতঙ্ক, তা এখন জানি।/ এটাও মানি, রয় না কিছুই। আকাশ সাদা রুমাল ওড়ায়।' ('কিন্তু

সে যে কিশোরী, তার', পৃ: ৩৩)। সত্যি কথা বলতে কি আখ্যানের রূপ, ভাবনার একধরনের চলন 'প্রথম দেখা' অংশে এত প্রবল, যে পাঠকের পক্ষে সেই চলার শরিক না হওয়া মুশকিল। এমনকি এই পর্যায়ের শেষ কবিতা ('নিশির ডাক', পৃ: ৩৪)—যেখানে এই রকম অবিস্মরণীয় লাইন রয়েছে : '...কার/ সাধ্য আছে শূন্যতাকে রক্তে ছোঁবার, / যখন দিবারাত্রি মলিন জলে ডোবে?' — শেষ হয় 'শেষ'-এরই আবহে: 'কে? অনন্ত সন্ধ্যা? তবে সময় হলো!/ মন্দিরে শেষ চূড়োয় ঘণ্টা বাজায় অন্ধ।/ এখন কিছুই হয় না। তোমার গোপন গন্ধ/ ফিরিয়ে নাও: আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।' যেন গোটা *অর্ধেক শিকারি*-র আখ্যানরূপের জমাট মহলা চলে প্রথম অংশেই। 'বিচ্ছেদ' অংশটির কবিতাগুলি নামহীন (আর কীই-বা হতে পারত?)। 'এক' থেকে 'সতেরো' পর্যন্ত এরকম নানান উচ্চারণ: 'ঝরে গেলো নষ্ট তারা; যেন কোনো রাক্ষুসে নিয়তি/ সংগোপনে বলে দিলো আর-কোনো আশা নেই তার'। (দুই, পৃ: ৩৭), 'বৃষ্টি হলে ছোটো জল বালকের খেলার ভেলারে। নিয়ে যায় যতদূরে, তত দূরে কোনো মনস্তাপ। কোনোদিনও যেতে পারে? শুধু হিংস্র বিরহের ধারে/ শিরা ফেটে রক্ত ঝরে অবিরাম চিৎকৃত বিলাপে/...' (পাঁচ, পৃ: ৪০)। 'কাতর বিকেল', 'হিংসুক সন্ধ্যাবেলা', সাপ আঁধার, মৃত্যু, স্বপ্নের ঝরে যাওয়া এই অংশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে কবিতাকে। এর মধ্যে বারো, চোদ্দো আর পনেরো নম্বর কবিতা তিনটি নানান দিক থেকে আলাদা বলে মনে হয়। কলকাতার পাঁজরে যে প্রকৃতি, শীত-পাখি-অকালবৃষ্টি-দোলনচাঁপা-নীল মেঘ ভাবনার প্রেক্ষিতটা মূলত: গড়ে দিচ্ছিল, এই তিনটি তার থেকে বেরিয়ে

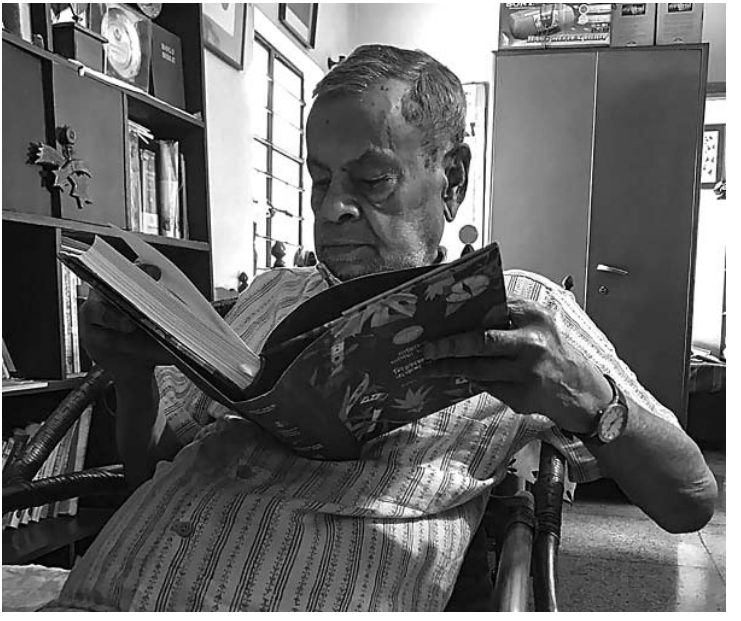

বা না-বেরিয়েই ব্যস্ত জন-পরিসরে পা রাখে। এদিক থেকে পরের অংশ 'উপদ্রুত উপত্যকা'র আগাম আভাষও এরা। 'এক হাতে বোমা আর অন্য হাতে গণতন্ত্র থাকে যদি কারু,/ তবে কোনটা নিতে হবে, বিধিবদ্ধ ভাবে নির্ধারিত!/ পুজো করে তোতাপাখি প্রাতস্মরণীয় বাঁধা বুলি!' (বারো, পৃ: ৪৪)। কবিতা যদিও কোনো রহস্যভেদ করার ধাঁধা নয়, তবুও চৌদ্দ নম্বরে, 'না কি এরা, জনরব শোনা মাত্র, ছুটে এলো সন্ধে সাতটায়,/ মাছের বাজার থেকে মরা চোখ, অন্যের চশমা, কতিপয়/ কৃতবিদ্য ঠুলি পরে উজ্জ্বল তামাশা দেখতে এল?' পড়ে মনে আসে একঘেয়ে বক্তৃতাসভার শ্রোতৃকুল, মঞ্চের ঘেরাটোপ থেকে দেখা। পনেরোয় ভিড়বাসে হুড়োহুড়ির পাশাপাশি জায়গা পায় মহানগরের নানান খণ্ডচিত্র। 'উপদ্রুত উপত্যকায়' অস্থির সময়ের ছাপ স্পষ্ট। কবিতা দীর্ঘ হচ্ছে, ছন্দ জটিলতর, অব্যক্তের যন্ত্রণা তীব্রতর হচ্ছে, কথা-লেখা-ভাষা-র সমস্যা বেশ জানান দিচ্ছে এই অংশে। 'যখন কাগজ পোড়ে', 'আ মরি বাংলা ভাষা' 'জগদীশ গুপ্ত' আভিধানিক আঁটবাঁধুনি পেরিয়ে কলম ছোঁয়াতে চায় ভাবনার ধ্বংসস্তূপে: 'বিপন্না, গুণ্ঠনহীনা, বিস্রস্ত ভাষাকে/ তিন-ফেরতা কুণ্ডলিত দেহে/জড়িয়ে উল্লাসে হাসে শব্দকোষ। সারাক্ষণ ভোল। যে পাল্টায়;' ('আ মরি বাংলা ভাষা', পৃ: ৫৩)। নিজের জীবন নিয়ে অস্বস্তি পেরিয়ে এই অংশেই প্রথম দেখা যাচ্ছে অন্যের জীবনের, গড়পরতা মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, কটাক্ষ। 'সাফল্য', সামাজিক, প্রতিষ্ঠানিক, তা সে যেমনই হোক-না কেন, তাকে নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ এই সংগ্রহের বাকি অংশ জুড়ে একটা মূলসুর হয়ে থাকবে। প্রথম বড়ো করে

দেখা যাচ্ছে *অর্ধেক শিকারি*-র তৃতীয় অংশের 'বাতাস' কবিতায়: 'সুতো ধরে টানতে হয়, চাকরি প্রেম রেফ্রিজারেটর চাও যদি।/ বন্ধুর আড়ালে দিয়ো নখে শান,.../' (১, পৃ: ৬৩), 'এখন ভীষণ হাওয়া বয়ে যায়—সর্বক্ষণ শুধু বয়ে যায়/ বিচ্ছেদ সর্বস্ব এই অন্তহীন তেরোশো পঁয়ষট্টি সাল জুড়ে—/সপ্তম মুদ্রাকে ছিড়ে স্তব্ধতা পাঠায় সংক্রামক/ধ্রুবতারা টান মেরে ফেলে দেয়। শ্মশান বন্ধুরা/আবগারির গল্প করে জ্বলন্ত চিতার পাশে বসে'। (৪, পৃ: ৬৪)। সব মিলিয়ে *অর্ধেক শিকারি* অপ্রতিরোধ্যভাবে এক বৃহত্তর আখ্যানের বোধ তৈরি করে, যেমনটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এই বইয়ের 'ফিরে-আসা' কবিতায়, বিদেশ থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতায়, সীমানা পেরোতে গিয়ে মস্তিষ্কে স্মৃতির 'সীমাহীন' পরিসর রচনায়। কী বলব এই বহুমাত্রিক 'চলা' কে?

'আত্ম' থেকে 'অপর'-এর দিকে যাত্রা নয় কি? শুধু 'দেখছি' নয়, 'যেভাবে দেখছি' সেটাকেও দেখতে পাওয়ার ইচ্ছে, নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা—যে কবিতার শরীর এরকম একটা কিছু ধরতে চায়, সে তো 'অর্ধেক শিকারি'ই: 'অর্ধেক শিকারি তুমি, অর্ধেক শিকার।/হেঁয়ালি নাট্যের মতো ধনুর্বাণ হাতে/ছুটেছিলে যার খোঁজে প্রাতঃকাল-রাতে/নিজেই জানোনি সে কি ছিলো নিরাকার।/.../তোমার জগৎ ভরে শান্তি নেই আর।/চমকে ওঠার মতো আবিষ্কারও নেই—/তোমার জ্বলন্ত গন্ডি বিফল কাজেই।' (পৃ: ৭৪), প্রায় উত্তর-আধুনিক এক বিষয়ীরূপের কল্পনা এরকম জোরালো অমিত্রাক্ষরে বাংলা কবিতায় আর কোথাও বেজে উঠেছে বলে মনে হয় না। অথচ এ তো ছয়ের দশকের গোড়ার দিককার উচ্চারণ। বহুমাত্রিক হলেও

আখ্যান-পারম্পর্যর 'আধুনিক' ভাবনা-পটের ভিতরেই! আসলে শুধু এ বইয়ে নয়, গোটা *কবিতাসংগ্রহ*-তেই, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'লাইন ডিঙানো চাল', তা দিয়ে যেন এক একটা দমবন্ধকে ফাটিয়ে ক্ষরণের পিচকিরি ছোটাতে চান মানবেন্দ্র। আর সেই কারণেই উঁকি দিয়ে যায় পালাবদলের বিষয়ী, ভবিষ্যতের কথক। মনে রাখব জরুরি অবস্থার বছরে এ বই উৎসর্গ করছেন 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' আর 'খোচড়'-এর লেখককে।

বাঁচাকাহিনী (রচনা: ১৯৬৪-১৯৭৪, প্রকাশ: ১৯৭৬) বইয়ে সাকুল্যে ছাব্বিশটি কবিতা; প্রথমটিতেই প্রতিরূপায়ণের বাতুল-জাহের নিয়ে সবধান-কথা: 'যেখানে দেখবেন ছাপা হয়েছে সুখে আছি/সেখানে পড়তে হবে আমার হাতে-পায়ে বেড়ি,/আর মুখে লাগাম পরানো ('ভ্রম সংশোধন! ভ্রম সংশোধন! ভ্রম সংশোধন!', পৃ: ৭৭)। এই কবিতাতে যেভাবে 'একা নিঃসঙ্গ আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা'-কে স্রেফ 'কল্পনার দৌড়' বলে ঠাট্টা করা হয়েছে, বোঝা যায় যে এমন এক কথকের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি যার দৃষ্টিটা প্রধানত বস্তুবাদী, যদিও 'ছেলেরা, অথচ, যায় বনে। না কি যেখানে বসতি/বাড়ে বন সেখানে? অথবা তারও বেশী হলো ক্ষতি/বুঝি? বাড়ে বন তবে কি বুকেই? কেউ জানে ঠিক?' (বারো, পৃ: ৮৭) অর্থাৎ এই দৃষ্টির সীমা প্রকট করাটাও জরুরি মনে করে সে। সমাজবদলের তাড়নায় Machismo নয়, রোমান্টিকতা তো নয়ই, কবিতায় ছাপ রেখে যায় বিশ্লেষণী মন, 'বিশ্লেষণ'-এর প্রান্ত উন্মোচন করার চেষ্টায় যে একবগ্গা জেদি। প্রান্তিক পদাতিক তো মাঝেমাঝেই ওপারে সটকাতে চাইবে, খুঁজতে চাইবে ধ্রুপদি মানবতাবাদী নির্মাণপটের বাইরে কোনো চেতনা। তাই কি

অসম্ভবের উদ্দেশে সাঁই সাঁই ফ্যাঁত ফ্যাঁত ধেয়ে যায় ভাবনা?— ‘ঘড়ির কাঁটায় চলে সবকিছু। সব কাজ রুটিন মাফিক।/সব কাজ? সব কিছু? /জানি না। অথবা বুঝি কিছুই করি না তবে ঠিক।/.../ আমাকে ভাবায় রোজ শুধু জীবজন্তুরা সম্প্রতি।/ইঁদুর কী করে জানে ডুবে যাবে অচিরে জাহাজ? (তেইশ, পৃ: ৯৮), কিংবা পঁচিশ নম্বর কবিতাটি যা ফ্যাসিবাদের গালে থাপ্পড় কষায় নির্মোহ উচ্চারণে: ‘শুমারিতে লোক কমবে, মিলে যাবে যথেষ্ট প্রোটিন/ সম্প্রদায়গত ভেদও এক্ষেত্রে আদৌ নেই কিছু।/এবং বাড়বে না এতে কোনোভাবে বৈদেশিক ঋণ।/ তাছাড়া, অভ্যেস নেই বলে হয়তো সাপখোপ ব্যাঙ বেজি ছুঁচো/একটু-বা অরুচিকর। কিন্তু নরশিশু তো তা নয়।’ (পৃ: ১০৬), কিংবা মরণোত্তর চেতনার কল্পনায়: ‘টেঁশে গিয়ে লাভ হল মুখ্যঃ/জিভে লেগে গেলো স্বাদ ব্রহ্ম/না-ই বা দু-মুঠো যদি জোটেও।’ (সতেরো, পৃ: ৯২)। এই নির্লিপ্ত ভাব, রিপোর্তাজের ধরন অ্যালা রেনের ‘রাত্রি এবং কুয়াশা’ (১৯৫৫) ফিল্মটির ধারাভাষ্যর কথা মনে পড়ায়। শ্রেণি এবং ক্ষুধা খুব বড়ো বিষয় হয়ে উঠছে ছয়-সাত দশকে লেখা এই কবিতাগুলিতে। কিন্তু কোথাও তার আবেগায়িত উপস্থাপনার চেষ্টা নেই। কারণ ‘অসীম’কে চিহ্নর স্তরে টেনে আনা অসম্ভব, যদিও অসীমের আভাস দেওয়া যেতে পারে চিহ্নব্যবস্থার ভেতর থেকেই! যেভাবে ‘দাদা আমি বাঁচতে চাই’-এর সীমাহীন যন্ত্রণাকে ঋত্বিক বোঝাতে চেয়েছিলেন ক্যামেরার ৩৬০° প্যানের অথবা ‘অন্য কোনো চেতনার’ অন্বেষণের মাধ্যমে, অনেকটা সেইরকম কৃৎকৌশল দেখা যাচ্ছে মানবেন্দ্রর এই পর্যায়ের কবিতা থেকে, যদিও আবেগের সীমা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার ঋত্বিকীয়

তরিকা পছন্দ নয় তার। শরীরকে 'উপস্থাপন' করার সমস্যা যে অনুপস্থাপনীয়-কে ভাষা বা বাচনের স্তরে টেনে আনারই সমস্যা, তা অনেক বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে এই পর্যায়ে। অথচ শরীর, যা কিনা অবশ্যই সমাজবদ্ধ, ভুলে যাওয়া অসম্ভব কথকের পক্ষে, যতই কলাকৈবল্যবাদ বলতে চাক: '.../ অর্থাৎ, কবিতা শুধু কবিতাই। অবিসম্বাদী এ-/মত: যদি সামাজিক হয়, তবে কবিতা বাঁচে না।' কবির উত্তর ভরসা জাগায়: 'বস্তি ভেঙে নিশ্চিত যেভাবে, কোনো উচ্ছাস ছাড়াই,/ কাচে কংক্রিটে গড়া পুরুষাঙ্গ চেতিয়ে দাঁড়ায়,/এই কবিতার ক্লাস যেন তারই সাদৃশ্যে দাম্ভিক।' (বারো, পৃ: ৮৬-৮৭)। নিপাত যাক পৌরুষ বা নারীর কমনীয়তা, ভাবনার এমন দু-মুখ খোলা বিশাল পট androgenous কোনো কথক-অবস্থান থেকেই বেরোতে পারে বলে মনে হয়।

উন্নয়ন, ক্ষমতার উত্তুঙ্গ বহুতল রূপ, সম্পত্তি নিয়ে মধ্যবিত্তের (এবং উচ্চবিত্তেরও) আদেখলাপনা, ঘর-পরিবার-আত্মীয়স্বজন-লৌকিকতা-দেওয়া-থোওয়ায় মত্ত থাকা একটা গুছুনে যৌনতুষ্ট শ্রেণির বেঁচে থাকা—গদ্যকবিতার সংকলন *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি* (রচনা: ১৯৭৮-১৯৮৮, প্রকাশ: ১৯৯৯) এসবকে ছুঁতে চায় এমন একটা পরিসরে ঢুকে, যা সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গে লেপটে থাকে: ঘর/বাড়ি। আর সবচেয়ে কাছের বলেই তার তত্ত্বায়ন সবচেয়ে বিস্মৃত, শরীরের যেমন। তাই ধরে নিই বাড়ি করা বা সাজানো 'ব্যক্তিগত' পছন্দের ব্যাপার। নেহাতই 'অন্দর' সেটা, 'বাহির'-এর, জন-পরিসরের বড়-বড় সংঘর্ষ, কুটিল রাজনীতি সেখানে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু যখন দেখি এই বাড়িশরীরের খোপে-খোপে, ঘরে-ঘরে একই রকম ইচ্ছের আরশি, তখন

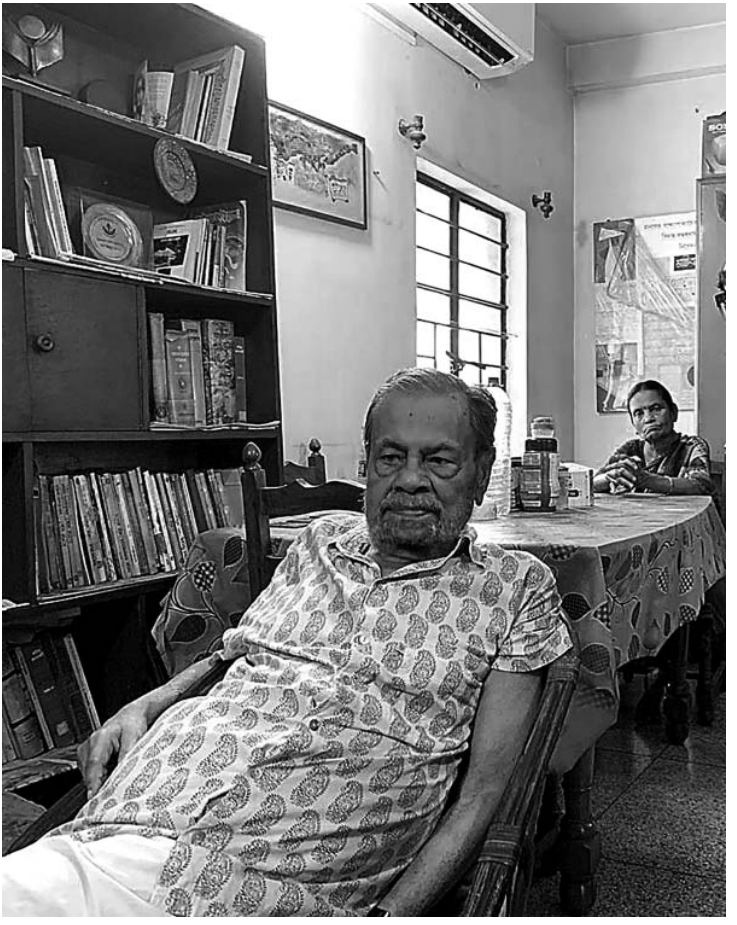

আর তাকে শুধু 'প্রাইভেট' বললে হিসেব চোকে না। বরং একটা পাবলিককেই ভাবা যায় দিব্যি। পর্দার রঙ বা বাথটবের মাপ-আকৃতি এক নাই হতে পারে। তবু ঘরে-ঘরে একই জীবন— এই পাবলিক তার উপনিবেশ নিরন্তর বাড়িয়ে চলতে চায়। ঔপনিবেশিকতা নিয়ে *বাঁচাকাহিনী*-র বাইশ নম্বর কবিতাটি মনে পড়ছে: 'আজ এই উৎসবের দিনে লাটিমের মতো ঘোরে/ চরাচর। একই তার কক্ষ, বৃত্ত, গতিপথ.../' এবং '/... মাস্তুলের পাশে আজও হাল ধরে/ক্রিস্টফার...', এবং বিশেষ করে 'লোক চাই লোক। দুরূহ নদীর দুই ভিন্ন তীরে/সেতু বাঁধা হবে। অথবা আফ্রিকা চিরে/ পাতা হবে রেললাইন। প্রধান হাওয়ায়/ত্রিনিদাদে আখ দোলে (কিংবা গিয়ানায়);/ দোলে ব্রেজিলে গমের শিস, অ্যাঙ্গোলায় কফিখেত,/ নতুন জগতে ভুট্টা, মেহিকোয় জমি ও জিরেত।' (পৃ: ৯৮)। প্রোমোটার উপনিবেশ বাড়ায়, চলে জমির খোঁজ, বাড়ে মধ্যবিত্ত জীবনের উপনিবেশ; মধ্যবিত্ত এদিক থেকে সত্যিই অর্ধেক শিকারি আর অর্ধেক শিকার।

আগাগোড়া সাধু ভাষায় লেখা *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি*। খানিকটা লোকশিক্ষের সুরে কথক বলে চলেন বাড়ি বানানোর তৌর-তারিকা: কীভাবে সাজাতে হবে, কীভাবে বাড়ির প্রতিটি ভাঁজ-পরতে চারিয়ে দিতে হবে পারিপাট্যের আঙুল, কতটা সাবধান হলে থাকা যাবে যারপরনাই নিরাপদ। 'বস্তুতঃ দুয়ারকে ঘিরিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে কত চমকপ্রদ বিষয়: ...গজাইয়া উঠিয়াছে খিল, হুড়কা, সুর্সা, শিকল, আংটা, হাঁসকল, দ্বারান্ত ওরফে তালা, এমনকী দুয়ার পাহারা দিবার জন্য দৌবারিক ওরফে দারোয়ান। শত্রুপক্ষের দুয়ারে নজর রাখিবার জন্য খোচর, দুয়ারের

সামনে টুলে বেয়ারা বা চাপরাশি। ... দরজার গায়ে বসানো যায় হাতল, যাহা ঠুকিয়া আওয়াজ করা যায়। অথবা বসানো যায় কড়া, যাহা নাড়িয়া হাঁকিয়া বলা যাইতে পারে, ভিতরে কেহ কি আছো? সত্য-সত্যই?' ('দুয়ার', পৃ: ১২১)। 'দুয়ার' কবিতায় খিল দিয়ে ঘরের নিরাপদ বলয়ে নিশিন্তিতে থাকার ক্ষমতা বা মালিকানা যাদের আছে তাদের সভ্যতার প্রায় একটা মানচিত্র আঁকা হয়। সদর-খিড়কির চোরা ফুটোফাটা কীভাবে গুলিয়ে দিতে পারে অন্দরবাহিরের সীমা, একটু অসাবধান হলেই কীভাবে টলমল করতে পারে এই আপাত ঠিকঠাক ধাঁচা, সে বিষয়ে তির্যক সতর্কবাণী এই কবিতায় এবং প্রায় সবকটিতেই। যেমন 'দেয়াল' কবিতাটিতে: 'প্রথমেই তো সজাগ লক্ষ রাখিতে হইবে কোন দেয়ালের কর্ণকুহর গজাইয়াছে, আর কোন দেয়ালই বা বধির এবং বোবা। ... বেডরুমে এমন দেয়াল চাই যে যাবতীয় গুপ্তকথা মুহূর্তে হজম করিয়া ফেলিতে পারে (পৃ: ১১৫), কিংবা 'কতই তো পাঁচিল আছে—কোনোটা ভিতরে ঢুকিতে দেয় না, কোনোটা আবার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে দেয় না। এই পাঁচিল কেন চাই তাহা না জানিলেও চলিবে।' (পাঁচিল, পৃ: ১১৪), কিংবা 'মেঝে/২'-এ পিছল মেঝেতে পা পিছলে আলুর দম হবার হুঁশিয়ারি: 'হয় নাই, তবে হইতে কতক্ষণ!' (পৃ: ১১৭)। ধুয়োর মতো ফিরে-ফিরে আসে 'কিছুই সহজ নয়। কিছুই সরল নয়-আর'। যুগযুগান্ত ধরে বিপুল অধ্যবসায় দিয়ে গড়ে তুলেছি গৃহসভ্যতার যে চিকন ঠাসবুনোট তা ফর্দাফাঁই হতে পারে না ভাবার কোনো কারণ নেই: 'এই তো, দেখুন না, মেঝেগুলি যেন দুলিতেছে। পাক খাইতেছে, পাতাল হইতে উঠিয়া আসিতেছে, আর মেঝে

যখনই উপরে উঠিয়া আসিতে চাহে তখন ছাতও কড়িবরগা সমেত নিচে নামিয়া পড়িতে চাহে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ মেঝে সম্বন্ধে আবারও বিস্তারিত চিন্তাভাবনা করাই বাঞ্ছনীয়। ('মেঝে/২' পৃ: ১১৮)। যে শ্রমের চিহ্নগুলো ঢেকেচেপে শৌখিনতার উদ্ভাস, সেগুলো বেরিয়ে আসতে পারে যখন-তখনই। 'বাসরঘর বা কয়েদখানা একরকম না-হইলেই কি শোভন হয় না?'-র মতো দারুণ ঠেস্ এই কবিতায় শুধু নয়, গোটা বই জুড়ে ছড়ানো। কথক উদ্দিষ্ট বাড়ির অধিবাসীর গলাতেই যেন কথা বলেন, আবার তফাতে থেকে তাকে নিয়ে ঠাট্টা, ফিচলেমি করতে পারেন—বহু বিভক্ত টুকরো-টুকরো স্বরের মধ্যে প্রধান হয়ে বাজতে থাকে ঘরের 'ভেতরের লোকের' performance। বিষয়ীর অবস্থানের এই বৈভিন্ন্য বা চকিতবদল যা কথনকে reflexive করে তোলে, এই কবিতার বই থেকে তীব্রতর হয়, বা বলা যায়, যত দিন যায়, কবির লেখায় বেশি করে ফুটতে থাকে। কবি যে একদা ছাত্রদের দেওয়াল-পত্রিকার জন্য 'ক্যাঁক করে খ্যাঁকশিয়ালিটি/কামড়ে দিয়েছে রিয়ালিটি' লিখেছিলেন তা বিলক্ষণ টের পাওয়া যায় 'জানালা' কবিতার প্রশ্নগুলিতে: '...বাড়ির ভিতর আলো-বাতাস খেলিয়া যাউক—এই রকম কোনো অভিপ্রায় কাজ করিলে বলিতে হয়, তাহা হইলে এত কষ্ট করিয়া বাড়ির দেয়ালগুলি তুলিবার মানে কী? দেয়াল যদি গড়াই হইয়াছিল, তবে তাহার ভিতর কতগুলি খোঁদল খুঁড়িয়া বিস্তর গোলযোগ পাকাইবার তাৎপর্য কী হইতে পারে?...জানলার কি দরকার কাহাকেও ভেতরে পুরিয়া দিয়া বাহির হইতে পাল্লাগুলি পেরেক ঠুকিয়া আটকাইয়া দিবার জন্য?' (পৃ: ১১৯)। ম্যাজিক-বাস্তবতা কি না জানি না, তবে এক রংদার পরাযুক্তি ভর করে এই কবিতার উপর। গোটা বইয়েই আমাদের

চেনা ঘর হয়ে ওঠে অপার রহস্যময়, হাজার প্রশ্নের ভুলভুলাইয়া: '...বাড়ি বিষয়ে যে-কথাই উঠুক না কেন। তাহাই রহস্যময়। ...কোনো প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই, প্রহেলিকা পূর্ববৎ সবকিছু আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মাথায় কেবলই আওড় পাকায়।' (পৃ: ১২০)। কেন জানি না পেটার বিক্সেল এবং বাস্টার কীটনকে মনে পড়ায় *সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি*-র কথকের চাল। এ সাপলুডো, না কি ঘরবাড়ি? কবিতায় পুরুষসিংহ চরিত্রটির ঠিক উলটো। কর্মজীবনের উপান্তে এসে ভাড়াবাড়ি বদলে নিজের আস্তানা গড়ে যে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হবেন, বা বলা যায় সাফল্যের আর পৌরুষের সংজ্ঞায় নিজেকে ফ্রেমবদ্ধ করে একটু 'উঠবেন', সেই একেলে ক্ষমতা নেই এনার। ভাগ্যিস নেই! ঋণের পাকেচক্রে জড়িয়ে বা ফেরেববাজের হাতে পড়ে নিজেই ফেরেববাজ বনে গিয়ে পতনের সম্ভাবনা সেখানে কম নয়। আর সব সিঁড়ি ভেঙে তরতরিয়ে উঠে যাওয়াটাও সত্যিই মইয়ে চড়া না আপাত-অদৃশ্য কোনো সাপের পেট দিয়ে তলিয়ে আসা, তাও খুব স্পষ্ট কি? ঘরবাড়ির থিতু নিশ্চিন্তির পাঁজরে সাপলুডোর অনিশ্চিত টলমলে খেলাকে ঢুকিয়ে দেওয়াটা হাসির পেটে ভয় সেঁধিয়ে দেওয়ার মতোই এলেমদার। মানবেন্দ্রর পাল্লায় পড়লে আপনার ছিমছাম ফ্ল্যাটটি নিমেষে ছমছমে হয়ে যেতে পারে।

এই সময় শনির (প্রকাশ: ২০০৩) বইটি বাকি বইগুলি থেকে আলাদা কারণ প্রায় গোটা কবিজীবন (১৯৫৬ থেকে ২০০০ সাল) থেকে ছেঁকে নেওয়া রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। বাকি বইগুলোর প্রত্যেকটায় সাত-দশ বছরের ছোটো-ছোটো সময়কালের রচনা। রচনার ক্রম এবং বিষয়ের ধারবাহিকতা—এ দুয়ের ভারসাম্য এই বইয়ে চোখে পড়ার মতো। প্রথম কবিতাটি

সে-ই 'প্রথম দেখা', এই সংগ্রহের প্রথম কবিতার যে নাম। ভীষণ স্পর্শযোগ্য একধরনের প্রেম এবং কাতরতা ছুঁয়ে যায় প্রথম দিকে: 'গলনালিতে জ্বালাধরানো মদিরার মতো/ শরীরে সেই ঘ্রাণের ঝাঁঝ লাগলো, আর নরম, পুরু, বিশাল/ দুই ঊরুর মধ্যখানে উথালপাথাল হ'য়ে গেলো/ চেতনা,../' ('অরণ্য-রাত্রি', পৃ: ১৪২), 'কিংবা কুমারী ছায়া ঢেকে রেখেছে তার গোপন শরীর, অলংকৃত সোনালি স্তনচূড়া, কাচের/ মতো নির্বিকার শব্দহীনতার ভিতরে তার অন্ধকার শরীরের অসম্ভব আভা।...'('উষ্ণ বাতাস', পৃ: ১৪৪), অথবা বয়ঃসন্ধির স্মৃতিতে, 'স্পর্শকে মনে হতো সোনালি ভোরের মতো, কুঁড়ি থেকে পাপড়ি ফোটায়/ আর শিউরোতে থাকে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ'। ('দুরন্ত তেপান্তর', পৃ: ১৪৫)।

অভিজ্ঞতার কাব্যিকতা থেকে বিশ্লেষণের নির্মেদ উচ্চারণ— সব কবির এ হেন ক্রমরূপান্তর হয় না, তবে মানবেন্দ্রর কবিজীবনে নির্ঘাৎ এরকম একটা কিছু ঘটেছে। ক্রমশই, এবং খুব দ্রুতই বলতে হবে, নিভৃত মনের বনের ছায়া থেকে বেরিয়ে গেছেন। পাঁচ-ছয় দশকের নেশা-ধরানো প্রেমের কবিতা লেখার মুন্সিয়ানা কবির শুধু ছিল না, দেখা যাচ্ছে অন্য অনেক সমকালীন কবির থেকে বেশিই ছিল। কিন্তু ও পথে হাঁটলেন না বিশেষ। প্রেমিক সত্তাটা, জীবনকে ঝালচাটনির মতো চাটতে-চাটতে, বুঝতে চাইল সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাস, নতুন করে জানতে পেল প্রেম-কেও। তার পরিধি তখন অনেক ব্যাপ্ত, কারণ 'মিলন, সান্ত্বনা, সুখ-স্বপ্নেরও ভিতরে নেই আজ প্রেমিকের।/বরং দেয়ালে শুধু প্রতিধ্বনি আছড়ে পড়ে, মাথা কোটে আঁধারে হাওয়ায়—/

বোবা কালা অন্ধ ছুরি/একরোখা হাৎড়ায় কোথায় তোমার বুক ধুকপুক করে।' ('একদিকে স্বপ্ন বুঝি?', পৃ: ১৪৭-১৪৮)। 'এখন অবেলা এলো, সময়কে শনিতে পেয়েছে'-র ('দুই হাত', পৃ: ১৪৭) বিপন্নতা এই বইয়ের আনাচে-কানাচে। 'শেষ'-এর আবহ নতুন উপলব্ধির জন্ম দেয় কয়েকটি কবিতা জুড়ে পর পর। 'শেষ অধ্যায়', কবিতা গুচ্ছের ৫ নম্বরটি যেমন: 'যখন গলায় কোনো শব্দই আসে না/ আমি শুধু অন্য কোনো গলা বেছে নিই/ যার স্বর ছিলো একদিন/ এবং এখনও হয়তো আছে—/' ('কৈফিয়ৎ', পৃ: ১৫২); প্রায় বিনির্মানবাদীর গলা পাওয়া যায়। 'এখানে ফুরুলো' (পৃ: ১৫২), 'শেষের পরে' (পৃ: ১৫২-১৫৩), এবং আরো কয়েকটি কবিতায় 'শেষ' আর 'শুরু' অনিঃশেষ এক পরস্পর নির্মাণের সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে: 'অন্তিম মুহূর্ত এসে আমাদের সকল চেষ্টার/সাফল্য-ব্যর্থতাগুলি আত্মসাৎ করার আগেই,/দিব্যি ভুলে যাচ্ছিলাম সূচনাপর্বের সব ঘনিষ্ঠ উত্তাপ।', 'যে ঘরে সমস্ত শুরু হয়েছিলো, সেখানেই সমাপ্তিরও সূচনা হয়েছে' ('শেষের পরে', পৃ: ১৫৩)। অনিদ্রার মুহূর্তগুলি শরীর দেয় এই কবিতাকে; 'ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে সারা রাত ছটফট করার সময়'-টা তো শুরু-শেষের দোলায় দোলারই সময়।

এই বইতে বিষয় এবং শৈলীর দিক থেকে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। যেমন একটা পর্যায়ে কলকাতা নিয়ে বেশ কয়েকটি কবিতা: ''নাইট মেয়ার সিটি', সাহেব বলেছিলো' ('উৎপল দত্ত-র জন্যে' পৃ: ১৫৯-৬০), 'চার্ণক্যপুরীর ছড়া' (পৃ: ১৬০-৬১), 'কলকাতা' ('গাবোর গারাই অবলম্বনে' পৃ: ১৬১-১৬২), 'এইখানে বাড়ি হবে। বহুতল...' (পৃ: ১৬২-৬৩)। সম্পূর্ণ প্রশ্নবোধক

বাক্যবন্ধ দিয়ে গড়া ব্যতিক্রমী কবিতা ‘সঠিক উত্তর দাও, ভাববার সময় দু-মিনিট’ (পৃ: ১৫৭-৫৮)। বেশ কিছু কবিতার স্মরণ-উৎসর্গ-অবলম্বনের উদ্দেশ্য যাঁরা, তাঁরা চিনতে সাহায্য করেন কবির ভাবনাজগৎকে: পল ভ্যালেরি, বব ডিলান, উৎপল দত্ত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সুতপা ও প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য্য, রবি ঘোষ, হাসান আজিজুল হক, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (ইনি এই বইয়ে নয় ‘অগ্রন্থিত’ অংশে) হেমেন মজুমদার, গাবোর গারাই।

ইলিয়াসের স্মৃতির উদ্দেশে লেখা কবিতাটিতে জন্ম নয়, মৃত্যু (প্রতিটি মৃত্যু?) হয়ে ওঠে জগতের জ্যন্ত বাঁকবদলের মুহূর্ত, স্মৃতির প্রাণবান রূপের জন্ম, এমন স্মৃতি যা অতীতচারিতা নয়, দারুণ সম্ভব এক স্বপ্নও: ‘ছবির ভিতরে যেই ঢুকে পড়ে কেউ,/ তখনই লাফিয়ে ওঠে জগতের রঙ্গ ও কৌতুক?... নিজেরই বৈচিত্রে মুগ্ধ বহুরূপী সমৃদ্ধ জগৎ/ভাবুক যা-খুশী তার—যতদিন পারে—/হয়তো বোঝেনি সে কী বদলে গেছে। সহসা অস্থির-/ জন্ম যা পারেনি আগে, মৃত্যু পারে কত অনায়াসে,/ কী করে জীবনে কেউ মেশায় স্বপ্নের পান, স্মৃতি।’ (‘ছবির ভিতরে যেই ঢুকে পড়ে কেউ’, পৃ: ১৭০-১৭১)। এক বিশেষ আঙ্গিকের কবিতা এই বইয়ে বেশ কয়েকটি— কাহিনিধর্মী কবিতা বা আখ্যান-কবিতা বলা যায় তাকে। ঘটনাপরম্পরা বা কাহিনির এক বিশেষ মুহূর্ত জুড়ে একটি চরিত্র—তাকে ঘিরে, তার অবস্থান-বোধ-অনুভব নিয়ে তৈরি হয় কবিতা। এরা রমলা, কালিদাস, শ্রীপতি, শ্রীনিবাস, মিনতি বণিক, নিরঞ্জন সাহা, সাধন মল্লিক, শিবতোষ মৃধা, বিপুল মণ্ডল, নীলিমা, সুধন্য, শ্রীরূপা, যুথিকা। এরা তৈরি করে স্মৃতি-প্রেম-সাফল্য-ব্যর্থতার জটপাকানো কিস্‌সা। জীবনের উপন্যাস

(না কি ছোটো গল্প?) নিথর উপলব্ধি হয়ে অদ্ভুত ভার তৈরি করেছে বলে মনে হয় প্রত্যেকটি কবিতায়: 'হুড়মুড় করেই এসে ঢুকেছিলো ভাড়ার ঘরে সে।/ অথচ তাড়ার কোনো কারণ ছিলো কি?/..../ ...তারপর এগিয়ে গিয়ে সে/খুলে দেয় দক্ষিণের জানালাটা—অমনি যেন অতি সন্তর্পণে/শেষ বিকেলের আলো ঘরে ঢোকে—এবং সমস্ত আরো ঝাপসা ক'রে দেয়।/.../নিরঞ্জন সাহা শুধু ফ্যালফ্যাল তাকিয়েই থাকে—/দেয়ালে হেলান দেওয়া পাথরের ভাঙাচোরা মূর্তির মতন—/ তারই মতো অর্থহীন। নিরস্ত্র ও নিস্ব, নিঃসম্বল—/এই ঘরে কাকে, কিংবা কী সে খুঁজে পাবে ভেবেছিলো?' ('নিরস্ত্র', পৃ: ১৫৬-১৫৭)। এরকম অজস্র উচ্চারণ এবং কোথাও রহস্যপান্যোসের মতো দ্রুতগতি আখ্যান ('জট', পৃ: ১৭৫), কোথাও বাজারচলতি কাগজের 'সমস্যা-সমাধান' কলামের অনুসরণে অভিনব সংলাপ-আঙ্গিক (সমাধান, পৃ: ১৮০)—কাহিনিমূলক কবিতায় দারুণ স্বচ্ছন্দ মানবেন্দ্র। প্রায়শই কথ্য ভাষার লঘু চাল এই ধরনের কবিতাগুলোকে বেশ তরতর করে পড়িয়ে নেয়, যদিও কবিতার দ্যুতি তার থেকে ঠিকরোয় দিব্যি: 'চিটফান্ড খুলেছিলে; বিস্তর তল্পি ও তল্পা ইয়াহু-ওয়াহু ডট কম' দিয়ে যে কবিতাটি শুরু হচ্ছে, শেষ হয় এভাবে: 'কিন্তু হায়, জাঁহাপনা, যতই পকেট থাক তোমার ও জিনসে ডেনিমে/ কাফনে কখনো কিন্তু পকেট থাকে না।' ('কিন্তু হায়, জাঁহাপনা', পৃ: ২০৯)। পপুলার বাচনরীতি আর গভীর-ভাবনার কোনো আবশ্যিক বিরোধ লেখক মানছেন না, যত দিন গেছে ততই মানেননি বোঝা যায়। লাতিন আমেরিকার সাহিত্য যিনি দীর্ঘকাল পড়িয়েছেন, অনুবাদ করেছেন, ভেবেছেন সর্বোপরি

তৃতীয় বিশ্বের জীবন নিয়ে, লিখেছেন খেলার উপন্যাস, লিখেছেন ছোটোদের জন্যে, তিনি কবিতায় পাণ্ডিত্যের ভারে জুবুথুবু হতে যাবেন কোন্ দুঃখে? বরং পাণ্ডিত্য এখানে রঙচঙে বাহারি কথামালার ডানায় চড়ে ভারহীন হতে পারে, এমনভাবে যে কোনো কবিতা কখনো কৃত্রিম দুর্বোধ্যতার আভাষ দেয় না।।

ধরা যাক 'আপাতত শান্তি, শান্তি...' কবিতাটির (পৃ: ১৭৬) কথা। বাপ-ছেলের যে গপ্পোটি নিয়ে কবিতা, তা সুবিদিত; স্ট্রাকচারালিজমের পাঠে বহু ব্যবহৃত উদাহরণ। যদ্দূর মনে পড়ছে টেরি ইগ্‌লটন তাঁর *লিটারেরি থিয়োরি: অ্যান ইনট্রোডাকশন* বইয়ের স্ট্রাকচারালিজম পরিচ্ছেদে এই কাহিনির 'মূল গড়ন' নিয়ে পণ্ডিতি নিদানকে একহাত নিয়েছেন। লিখিয়ে ভাবনার ফটক আটকে দিলেও, বেয়াড়া শর্ত ঘাড়ে করে বেকুব পাঠকের অনধিকার প্রবেশ আটকায় কার সাধ্যি? আমাদের কবি ইগ্‌লটনের পক্ষেই, তবে বেড়া ডিঙানোর প্রস্তাব বক্তিমের চালে নয়: 'কী আছে কাহিনিটাতে—প্রতীক? না নিছকই গড়ন, রূপ, কাঠামো, বিন্যাস? / তা নিয়ে ভাবুক যদি কেউ চায় দেশে বা বিদেশে / ফুকো বা দেরিদাগন, ফ্রাই-লেভি স্ত্রাউসের চেলা যারা—পণ্ডিত ক্রিটিক / আপাতত শান্তি, শান্তি: কাহিনীর শেষ পাতা / বিশল্যবরণী হয়ে সামনে গজায়।/ ধ্বনি তোরঙ্গের মাঝে বাটপাড় সন্তর্পণে ওস্তাদি দেখিয়ে যদি দু-হাত সেঁধোয়,/ লেখক বেচারা তাতে কী-বা করে? সে তো আর কোতোয়ালি নয়!' এমন প্রশ্রয় আর ভরসা দিলে এবং বারবার 'শেষের পরে' লিখতে থাকলে, মামুলি পাঠকের তো পোয়াবারো! এখন ঠেলা সামলাবে কে?

প্রথম প্রকাশ: 'অন্তঃসার' সেপ্টেম্বর ২০০৫

আলোকচিত্র সৌজন্য: দীপঙ্কর দাশ

সৌম্যদীপ

অনুবাদেন্দ্র : কবিদের কবি
কিছু কৈশোর-স্মৃতি

বিদেশি লেখকদের নামের উচ্চারণ বিষয়ে বাঙালি একটি প্রবল গেঁড়েমি আছে, 'সঠিক' উচ্চারণের প্রতি তার অসম্ভব ন্যাকা আনুগত্য, অথচ তাদের নিজেদের কোনো নাম তার দেশেরই কোনো অঞ্চলে সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না। এমনকি তার 'বিশ্বকবি'-র পিতোমো পদবি বিলিতি উচ্চারণে অ্যাইসান বিকৃত যে তিনি সেই বিকৃত উচ্চারণেরও বিকৃত বানানে নিজের পদবি 'টেগোর' (Tagore) বহন করে 'বিশ্ববরেণ্য' হয়ে ওঠেন। এই পিঁয়াজি ভাঁজবার একটা কারণ আছে—বাংলা অক্ষর দ্বারা প্রায় সব উচ্চারণ সঠিক ভাবে লেখা সম্ভব। সম্ভবত উপেন্দ্রকিশোর

লিখেছিলেন, বাংলা অক্ষরে যেমন অন্য সব ভাষায় সকল কথা লেখা যায় সেরকম কিন্তু সব ভাষায় চলে না। [...] একজন জাপানি ভদ্রলোক ট্রাফালগারের সম্বন্ধে জাপানি ভাষায় কী যেন লিখছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেখানে ট্রাফালগার কথাটা আছে, সেটা তিনি ইংরেজিতেই লিখছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কথাটা ইংরেজিতে লিখলেন যে?' জাপানি ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের ভাষার অক্ষর দিয়ে ট্রাফালগার লেখা যায় না'। সবচেয়ে কাছাকাছি যা লেখা যায় তার উচ্চারণ হচ্ছে 'ত্রা-ফারু-গারু'। ছোট্টবেলায় পড়া, সত্যতা বিচার করে দেখিনি, কিন্তু বিষয়টা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি অনেকবার!

Czesław Miłosz দেখে-পড়ে 'চেশোয়াভ মিউশ' উচ্চারণ করাটা বিশ শতকের শেষভাগের বাঙালি কবিদের জিহ্বায় প্রায় অসম্ভব ছিল, যদি না অনুবাদেন্দ্র জন্মাতেন। এখনকার মতো অনায়াসে উইকি-তে খুঁজে উচ্চারণটা 'Listen' টিপে জানা সম্ভব ছিল না।

অনুবাদে জানার ফলে বিপদটা হতো বিপরীত দিক থেকে— অন্তত আমার হয়েছিল। অবশ্য সেটা মিউশকে নিয়ে নয় 'কবিদের কবি' র‍্যাঁবো-কে নিয়ে। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে *শার্ল বোদলেয়ার ও তাঁর কবিতা* আর বিশ্ববাণী প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অন্যদেশের কবিতা*-র সূত্রে র‍্যাঁবো-র নাম জানা ছিল ক্লাশ নাইনে উঠতে-না-উঠতেই, মেহিকো, চিলে, হোর্হে এসব পেকেমো-ও রপ্ত করছি ছোটোপত্রিকা বা প্রকাশনাগুলোর দৌলতে— *অন্যদেশের কবিতা*-য় র‍্যাঁবো-র কবিতা ছিল না, কিন্তু সুনীল 'র‍্যাঁবো' উচ্চারণ নিয়ে আরো প্যাঁচাল পেড়েছিলেন—

“সুররিয়ালিজম শব্দটা ব্রেতো পেয়েছিলেন আপোলীনেয়ারের রচনায় কিন্তু এর বীজ ছিল আরও অনেক আগে হ্র্যাম্বোর লেখায় বা আরও আগে নার্ভাল, বালজাকের মধ্যে। পৃথিবীর সেই চরম বিস্ময়কর কবি, দুর্দান্ত বখাটে বালক হ্র্যাম্বো—আজ সুররিয়ালিজমের প্রধান পুরুষ, সিমবলিস্টদের প্রধান হিসেবে খ্যাত, এমনকি এক্‌জিস্‌টেনসিয়ালিজমের প্রবক্তা হিসেবেও গণ্য, আবার ক্লোদেল ওঁর রচনা পড়েই ক্যাথলিক হবার প্রেরণা পেয়েছেন। (Rimbaud বাংলায় লেখা হয় র‍্যাঁবো। কিন্তু দেখেছি ফরাসীরা ও উচ্চারণ শুনে চিনতেই পারে না। ওরা যেভাবে উচ্চারণ করে সেটা বাংলায় লিখলে অনেকটা শোনায় হ্র্যাম্বো। আমি বিদেশি উচ্চারণের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে নই, জ্ঞানও খুবই কম, নিতান্ত নতুনত্বের লোভেই র‍্যাঁবো-র বদলে হ্র্যাম্বো লিখতে মাঝে মাঝে লোভ হয়)”—ফলত আমার মাথায় মাতৃভাষার চাপে যা হয়, ‘জন র‍্যাম্বো’-র সাথে ‘আর্তুর র‍্যাঁবো’ বা ‘হ্র্যাম্বো’ রয়ে গেলেও Rimbaud শব্দটা ইংরেজি বানানে স্মৃতিতে রক্ষিত হয়নি। ওই বইয়ের শুরুতে গীয়ম আপোলীনেয়ার এর কবিতা ছিল, ‘অ্যাপলিনেয়ার’ উচ্চারণও দেখেছি; তারপর পুষ্কর দাশগুপ্তর ‘গিয়োম আপলিনের’।

এসব সঠিক উচ্চারণের গুঁতোয় জীবনের বই বিষয়ে বড়ো আফশোষের কাজটা করেছিলাম। জেলার সবচে নামি স্কুলে ছোট্ট থেকে ‘গার্জেন কল’-এর ভয় পেয়ে তারপর কলেজে পৌঁছে ‘দ গার্ডিয়ান’ উচ্চারণ ‘Go কেন গু হবে না’ মার্কা ছ্যাবলামো ছাড়া আর কিছু মনে হওয়া সম্ভব নয়; তা সে যে যতই পণ্ডিতি উস্তাদি কালোয়াতি এক্‌সেন্ট ভাঁজুন না কেন—

ভেবে দেখলে সত্য এটাই (নতুবা বিলিতি খবরের কাগজটা থাকে, তার গার্জেন-গিরির বাসনা বা ঘোষণা বাদ পড়ে যায় দ্বিতীয় ভাষার শব্দার্থ থেকে, অথচ সেভাবেই মান্য হয় উচ্চারণ কেতায়)। বাঙালির এই উচ্চারণ স্বভাব চূড়ান্ত হাস্যকর; জাতি হিসাবে এক ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সের সর্বব্যাপী নজির। যা বলতে যাচ্ছি তা এই উচ্ছিষ্ট উচ্চাঙ্গের উচ্চারণশীলতা ও তার ফল ভোগান্তির গল্প—

তখন একুশ-বাইশ বছর বয়স, বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট ধরে জানবাজার হয়ে অথবা রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড ধরে সোজা ওয়েলিংটন মোড়ে শাহদাত-দার দোকানে আসতাম প্রতিদিন। তারপর সেখান থেকে কফি হাউস। তার সাথে দাম-দর করলে মুখে একটি লজ্জ ছিল, "সোনার মাল নেবেন আর কাদামাটির দাম বলবেন"। সেকালে শাহদাত-দার কাছ থেকে আমি অনেক বই পেয়েছি পনেরো থেকে পঁচিশ টাকা দামের মধ্যে যেগুলো কলেজ স্ট্রিটে চল্লিশের কমে কেউ দিত না। সব বই নেড়েচেড়ে দেখা আমার অভ্যাস নয়, তাই হাতে তুললেই দেখলাম দাম বেড়ে যাচ্ছে, তার কাছে বই কেনার জন্য তাই মাঝে মাঝে নাটক করতাম, যেটা আমার দরকার সেটার দাম সরাসরি জিজ্ঞেস না করে, প্রথমে যেগুলো নেব না সেগুলোর দাম জিজ্ঞেস করে, শেষে খুব অবহেলা ভরে—"ওইটা কত নেবেন?"—এইরকম। তবুও সে ঠিক ধরে ফেলত। অন্তত বারদশেক আমায় শুনিয়েছেন ঢ্যাঙা-বাবু এককালে ওনার কাছ থেকে অফিস ফেরতা বই নিতেন। আমি কোন্‌গুলো নিতে পারি মাস ছয়েক পর থেকেই বেশ বুঝে গেছিল। "আসুন আপনার

জন্য রেখেছি", বলে পেছন থেকে বের করত। একদিন ফ্রেঞ্চ-ইংলিশ বাই-লিঙ্গুয়াল দুটো কবিতার বই বার করল—একটা Charles Baudelaire আরেকটা Arthur Rimbaud—শার্ল বোদলেয়ারকে চিনতে পারলেও, 'আর্তুর র‍্যাঁবো'-কে আমি চিনে উঠতে পারিনি, দুটো পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিল, শেষমেষ চল্লিশে দুটো দিতে রাজি হয়েছিল, সেদিন আমার কাছে অতটা খরচ করার মতো টাকা ছিল না, আমি কুড়ি দিয়ে বোদলেয়ারকে ঘরে এনেছিলাম, শাহদাত-দা বলেছিল "নিয়ে যান কালকে দেবেন" —আমি নিইনি; মাসের শেষ হাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। সেসময় দশটাকায় অফিস যাওয়া-আসা, দু-প্যাকেট চারমিনার, কফি হাউসে দেড়-কাপ ইনফিউশন হয়ে যেত। মাঝরাতে বোদলেয়ারের পাতা উল্টাতে উল্টোতে আমি হঠাৎ বুঝতে পারি কী ভুল করেছি! পরের দিন এক কলিগের কাছে টাকা ধার করে চার-তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে দোকানে পৌঁছে দেখেছিলাম সেই বইটা আর নেই। "আপনি তো বললেন নেবেন না! আজকেই দুপুরে এক ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন।"

—র‍্যাঁবো-র সেই দ্বিভাষিক সংকলন আমি ইচ্ছাকৃতভাবে আজ পর্যন্ত কিনিনি, মনে রেখে দিয়েছি আমার অশিক্ষা/কুশিক্ষার নমুনা হিসেবে। এরকম সমস্যায় পড়েছি মানবেন্দ্রকৃত তরজমা পড়েও—

'মুখোশ ও মৃগয়া'-র শুরুতে স্তানিসোয়াভ লেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লেখেন, "তাঁর একটা চমকপ্রদ বই হল 'নিখুঁত শূন্য', সেখানে যেসব বই আজও লেখা হয়নি, তার সমালোচনা ছাপা হয়েছে—এই যুক্তিতে যে যেসব মানুষ কোথাও জন্মায়নি

তাদের নিয়ে যদি কাল্পনিক কাহিনী ফাঁদা যায়, তবে যে-সব বই লেখা হয়নি তাদের নিয়েও কাল্পনিক তর্ক উত্থাপন করা যায় নিশ্চয়ই।"—কিশোর মস্তিষ্কে চূড়ান্ত বিস্ময় জাগানো এই 'নিখুঁত শূন্য' যে A Perfect Vacuum সেটা খুঁজে পেতে অনেক বছর সময় লেগেছিল সেই ইন্টারনেট পূর্ব যুগে। তার আগেই হোর্হে লুইস বোর্হেস বা বোর্খেস চিনিয়ে দিলেন Herbert Quin-কে; তাঁর নভেল স্ট্রাকচারের বীজগাণিতিক রাশিমালায় ধাঁধা লাগতেই, স্যার সুদর্শন গুপ্ত জানিয়েছিলেন Herbert Quin ও তাঁর রচনা সবটাই কাল্পনিক! বোর্হেসের বানানো! সাধারণত এরকম ঘটনাগুলোকে আমরা তখন 'ঢপবাজি' বা 'মুরগি করা' বলতাম। তিন-চার জন মিলে একজনকে সম্পূর্ণ বানানো ঘটনা সাক্ষ্য-প্রমাণসহ বিশ্বাস করিয়ে 'ঘোল খাওয়ানো' প্রায় নিত্যদিনের খিল্লি ছিল! আর এ খেলায় শিকারিদের কাউকে শিকার বনে যেতে হত মাঝে মাঝে ডাবল-ক্রসের বদমাইশিতে। তদুপরি জানা হলো পীয়ের মেনার্ড-এর 'Quixote' লিখন!!! এই যে মস্তিষ্কের গ্রে-মেটিরিয়ালে উথাল-পাথাল, খনন-মনন-মন্থন-রমন-স্তম্ভন—এই যে কর্ষণ, তা জমিকে অতি উর্বর করায় জলজ্যান্ত নিজ-চরিত্র বাস্তবিক নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্রায় কাল্পনিক হয়ে উঠেছিল; আর যা থেকে তৈরি হয়েছিল আমারই নামের একটা ছেলের 'গল্প'! যার সাথে আমার বিশেষ কোনো মিল আজ এই প্রৌঢ়ত্বে এসেও আমি আবিষ্কার করতে পারিনি, কারণ সে ব্যাটা আজও 'ছেলে'-ই রয়ে গেছে! তবে এরকম ব্যাপার যে খুবই সম্ভব তাও জানা ছিল! স্তানিসোয়াভ লেম-এর লেখা সম্পর্কে ওখানেই মানবেন্দ্র লিখেছিলেন, "যদি

কোন প্রকৌশল থাকে আমাদের হাতে, কোন মগজের যে অনেকগুলো প্রতিলিপি তৈরি করে দিতে পারে, সেই ভিন্ন ভিন্ন একই মগজ এর যদি একই স্মৃতি থাকে, তার দখলে যদি থাকে একই তথ্যের ভাঁড়ার, একই অস্মিতার ধাত, একই ব্যক্তিত্ব, এই নতুন মগজ তবু হয়ে উঠবে এক 'ভিন্ন আমি'-র আধার। এই ব্যক্তিচৈতন্য এই অনুভূতিপ্রবণ সংবেদী, এই ব্যক্তিরূপই (পোল ভাষায় লেম ব্যবহার করেন ওসোবোভোশ্চ্ শব্দটি) এই বিশ্বে তাহ'লে একমাত্র বস্তু যার কোন পুনরাবৃত্তি হয় না—একবার সে হারিয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। অথচ ব্যাপারটা আরো বিপন্ন— কেননা তাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় শারীরিক ছকেরই ওপর, যেটা তাকে (মগজ, জৈবরূপ) ধরে রাখে, ফলে কত সহজেই এই অদ্বিতীয়কে খতম করা যায়। এই বিশাল উদাসীন এলোমেলো বিশ্বে ওসোবোভোশ্চ্ তাই ভঙ্গুর পলকা ক্ষণজীবী এক অদ্বিতীয়ত্ব।"

আজও লেম-এর Dialog বা 'দ্বিরালাপ' এর ইংরেজি বাংলা কিছুই হস্তগত হয়নি, 'ওসোবোভোশ্চ্' শব্দটা রয়ে গিয়েছিল মাথায়, এই লেখায় উদ্ধৃত করবার জন্য পোকায় কাটতে শুরু করা বইটা খুঁজে লাইনগুলো টুকতে টুকতে যে অর্থে আজ প্রকাশ করলাম, মাধ্যমিক পেরোবার সময় এভাবে বুঝেছিলাম কী? উত্তর—হয়তো 'হ্যাঁ' হয়তো 'না'! সেটাই 'ওসোবোভোশ্চ্'-র অস্তিত্বের প্রমাণ। হয়তো 'ওসোবোভোশ্চ্' ক্ষণজীবী বলেই সবচেয়ে সহজ কার্য—সরাসরি মানববাবুর ছাত্র হয়ে যাওয়া বা স্রেফ কফি-হাউসে দেখা করে একটু জেনে নেওয়া— সেটুকুও করা হয়ে ওঠেনি! তাহলে এই স্মৃতিচারণা লেখার কারণ কী?!

মৃত্যু আর ফুলের গন্ধ
ভলতের
জাদিগ ও অন্যান্য উপাখ্যান
খুদে রাজকুমার
অনুবাদ : এষা দে
প্রস্পের মেরিমে
কারমেন
আধুনিক বিদেশী কবিতা
নির্বাচিত কাহিনী
তরুণ ঘটকের অনুবাদ
লা রোশফুকোর
মাক্সিম
তাল-মদিরা মাতাল
এমোস তুতুয়োলা
বুলবুল
চিকি আর নদী
চিনুয়া আচিবি
টোকোলোশ

কারণ, আমার এই লেখায় মানবেন্দ্র কাল্পনিক চরিত্র একশো শতাংশ কিন্তু অনুবাদ-গ্রন্থগুলি বাস্তব; অবশ্য সেসময় সেটাও যাচাই করা অসম্ভব ছিল— কেউ একজন বলেছিলেন, "মানব যাদের কবিতা অনুবাদ করে তারা আসলে নেই, ও নিজের লেখা ওইসব নামে চালায়"—আদপে এ-লেখা ঘোষপাড়ার 'অর্জ্জুন'-দের বিপ্রতীপে অগুনতি একলব্যের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাক-বেঞ্চ থেকে হাত তুলে "উপস্থিত" বলবার মতো।

মানবেন্দ্র বোর্হেসের অনুবাদ করেননি, হয়তো করবেন না বলেই, নইলে সেটাই প্রথম পড়া স্বাভাবিক ছিল। বোর্হেসের কবিতার অনুবাদ একটা বই পড়েছিলাম তার আগে। যাই হোক বোর্হেসের ওই Herbert Quin-এর গল্পের "অরিজিনাল" দর্শন স্যার সুদর্শন গুপ্তর কেনা কালেক্টেড ওয়ার্কস্ এর সুবাদে। "পড়, পড়—না দেওয়া যাবে না; এখানে বসেই পড়, এই গল্পটা আগে", ইংরেজি অনুবাদ কী-করে অরিজিনাল হয় জানি না— হতেও পারে, কারণ তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের অরিজিনাল ছিল, "কীটস, শেলী, বায়রন, ব্লেক, কোলরিজ আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ", (—"এতদিন যা পড়েছিস পড়েছিস; আর ওই গেঁয়ো ভাষা মাথায় ঢুকিয়ে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ নষ্ট করিস না।" অথচ পড়াবার সময় কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করতেন, "কেন!" জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসত "ওই যে তোদের বান্ধবীরা ফ্যান্তা-র দোকানের মরা খাসির মতো চোখ করে তাকিয়ে আছে, ওরা এসব না লিখলে নম্বর পাবে না") স্যারের মত ছিল, অন্যান্য বিদেশি ভাষার লেখকদের ইংরেজিতে পড়া যেতে পারে, ও-ভাষাগুলো কাছাকাছি, অনুবাদ করা সম্ভব, বাংলাতে হয় না। স্যারের এই

বিশ শতকের পর্তুগীজ কবিতা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অন্য দেশের কবিতা
স্পেনের গৃহযুদ্ধের কবিতা
কবিদের রক্তমাংস কবিদের যুদ্ধ
নির্বাচিত কবিতা
হাফিজের কবিতা
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
প্রেমে পরবাসে
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট:
কবিতা সংগ্রহ
বিষ্ণু দে অনূদিত এলিঅটের কবিতা
বিংশতি কবিতা
হোল্ডারলিন-এর কবিতা
FRIEDRICH HÖLDERLIN
অনুবাদ ভূমিকা টীকা বুদ্ধদেব বসু
রোগা ঈগল
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
লুই আরাগঁর
গিয়োম আপলিনের কবিতা
পুষ্কর দাশগুপ্ত
অনুবাদ
রবীন্দ্র সরকার
কস্টিস পাপাকংগোস-এর কবিতা

মতামত খুব একটা পছন্দের ছিল না, কিন্তু এত খারাপ খারাপ অনুবাদ দেখা যেত যে বিরোধিতা করা যেত না, কিন্তু বু.ব-র হোল্ডার্লিন, বিষ্ণু দে-র এলিয়ট, অলোকরঞ্জনের রিলকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুলেমেনভ, নাজিম হিকমত এসবও তো ছিল। (এখন গুগল ট্রান্সলেটর-এর সুবাদে স্যারের কথা অনেকটাই মেনে নিয়েছি, ফ্রেঞ্চ জার্মান স্প্যানিশ পোলিশ ইত্যাদি ভাষাগুলো ওখানে দিব্য বুঝবার মতো ইংলিশ ট্রান্সলেশন হয়ে যায়। আর ইংরেজি থেকে বাংলা করলে সেটা বুঝবার জন্য ক্রিপ্টোলজিস্ট প্রয়োজন।) বাংলা অনুবাদ অধিকাংশই ভয়ানক হলেও অনেক সময় তারা যা দিয়েছে তার "অরিজিনাল" পাওয়া সম্ভব হয়নি। তার উদাহরণ মানবেন্দ্র-র *পেটার বিকসেলের গল্প*, তার আজও কোনো ইংরেজি অনুবাদ পাইনি, পাইনি সুবীর রায়চৌধুরীর করা *টোকোলোস*-এর ইংরেজি অনুবাদ! ইংরেজিতে পড়া অভ্যাস হলে বাঙালি আর বিদেশি লেখকদের অনুবাদ পড়া পছন্দ করে না, আমিও না, কিন্তু কবিতা বিষয়ে আমার মত কিছুটা ভিন্ন। সে-প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি।

স্যার ধরে ধরে পড়াতেন এলিয়ট অথচ প্রশংসা করতেন এজরা পাউন্ডের। বই খুলে খুলে দেখাতেন, "এই দেখ ইনি হলেন গুরুদেব"। এছাড়া অধিকাংশ ফরাসি কবির নাম ও কিছু কবিতা স্যারের মুখেই শোনা— যেমন পল ভ্যালেরি, স্তেফান ম্যালার্মে—সে-বছর নোবেল পেলেন অক্টাভিও পাজ, তাঁর কবিতাসমগ্র ইংরেজিতেই পড়লাম স্যারের কাছে, কবিতায় কোলন (:) দেওয়ার অভ্যাস হয়েছিল তা থেকে মাস-দুয়েক! ওই সময়েই স্যার প্রথম পড়ালেন মার্কেজ, *লাভ ইন দ্য টাইম*

সারা কিশ-এর কবিতা
এভারলীন নিকোডিমাসের কবিতা
যদিও আমার হৃদয় গর্জমান
ব্রেখটের কবিতা ও গান
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুবাদিত
টোমাস ট্রান্সট্রোমার
জীবিত ও মৃতের জন্য
জাক প্রেভেয়ারের কবিতা
অনুবাদ
পলাশ বরন পাল
জন মিল্টন
অ্যারিওপ্যাগিটিকা

অফ কলেরা। স্যার নিজে যখন যা পড়তেন একটা ছোটো খাতায় পছন্দের লাইনগুলো লিখে রাখতেন, যে-অভ্যাস আমারও ছোটোবেলা থেকেই ছিল কলেজে পড়া ইস্তক। পড়ানো শেষ হয়ে গেলে আমাদের দু-একজনকে স্যার একটু বসে যেতে বলতেন; ওই খাতা আর বই বার করে পড়ে শোনাতেন, কখনো চিহ্নিত অংশ পড়তে বলতেন। কিছু লিখেছি কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। পড়ে শোনাতে হত। পাবলো নেরুদার কবিতা স্যার পছন্দ করতেন, ব্রেখটের নাটকও। এগুলোর বাংলা অনেক অনুবাদ সেসময় সহজলভ্য ছিল, অধিকাংশই ব্যক্তিগত প্রকাশনা বা ছোটো-পত্রিকা গোষ্ঠী প্রকাশিত। নেরুদা, লোরকা, ব্রেখট পেরিয়ে ইলেভেনে উঠতে না উঠতেই পল এলুয়ার, লুই আরাঁগ, লোকনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদে অঁরি মিশো সেখানে পিপুফিশু 'প্লুম'। কবিতার অনুবাদ পড়া স্যার পছন্দ না-করলেও অঁরি মিশোর ওই অনুবাদ ও তৎসহ প্রবন্ধ স্যারের খুব ভালো লেগেছিল আমার কাছ থেকে নিয়েই পড়েছিলেন ...

আমি একটা সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে-কোনো কবির অনুবাদ কেউ করেছেন দেখলেই কিনে রাখতাম, পড়া হলেও, যদিও খুব কম সময়েই সে অভিজ্ঞতা সুখকর হতো তবুও। আদপে যে ভাষাতেই পড়ি না কেন কবিতার অনুরণন আমার মস্তিষ্কে হয় সেই বাংলা ভাষাতেই, আনসান স্ক্যান-স্যান শিখলেও তা পরীক্ষার খাতা ছাড়া বিশেষ কাজে লাগে বলে মনে হয় না। তবুও অভিজ্ঞতা অনেকরকম— যেমন কবিতা পড়া-টা একরকম ছেড়ে দেবার পর ২০১১-য় নোবেল পুরস্কার পেলেন সুইডিশ কবি টোমাস ট্রান্সট্রোমার, যাঁর গোটাদশেক

কাব্যগ্রন্থ প্রায় পুস্তিকা বলা চলে, দু'ফর্মা পেরোয় না, গদ্য আত্মজীবনী সহ 'কালেক্টেড ওয়ার্কস' দুশো পাতার মতো—খবরের কাগজে এটুকু পড়েই বুঝলাম এঁকে আমি চিনি, একটা বইয়ের অনুবাদ পড়েছি অনেককাল আগে, 'জীবিত ও মৃতের জন্য'—খুঁজতে খুঁজতে বেরোল—মূল সুইডিশ থেকে বাংলা রূপান্তর করেছিলেন গজেন্দ্রকুমার ঘোষ নামে এক সুইডেন প্রবাসী বাঙালি। প্রকাশক 'রানী', ১৩ সি কলেজ রো, ১৯৯৪-এ বেরিয়েছিল। সেসময় এটাই ছিল ট্রান্সট্রোমারের শেষ বই। তাঁর প্রথম বইয়ের মতোই তা-তে ছিল মাত্র সতেরটি কবিতা। হাতে নিয়েই সবটা মনে পড়েছিল—খুব ভালো লেগেছিল ঘটনাটা; কিন্তু প্রথম কবিতাতেই—

It was an internal weeping that bled him to death

"অন্তরের কান্না ছিল তা, যা তাকে রক্তাক্ত করেছিল—মৃত্যুর প্রতি"

অথবা Good-bye eleven-knot convoys! Goodbye 1940! —এর অনুবাদ,

"বিদায় হে দ্বাদশ-সমুদ্র মাইল কনভয়। বিদায় ১৯৪০"—স্যারের কথা আবারও মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।

বোধহয় অনুবাদে কবিতার চেয়ে কবিদের সম্পর্কিত লেখাগুলি আমার বেশি মনে থাকত। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রম— যাঁর করা বেশ কিছু কবিতার তরজমা এবং কবি ও কবিতা সম্পর্কিত লেখা সবই আমার ভালো লেগেছিল।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম আমি প্রথম খেয়াল করি *স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে* নামের মোটাসোটা বইটাতে

সম্পাদক রূপে, কৃষ্ণনগর বইমেলায়, যতদূর সম্ভব ১৯৮৯ ডিসেম্বর। (পরে দেখেছি *জুল ভের্নের শ্রেষ্ঠ গল্প*-র অনুবাদ, *ঘণ্টা বাজে দূরে* —হান্স আন্ডারসেনের জীবন-উপন্যাস, তাঁর লেখা, যা আমার ছিল।) সেসময়ে বেশ দামি বই, পঁচাত্তর টাকা—তখন এক প্যাকেট চারমিনার দু-টাকা, পঁচিশটা বিড়ির প্যাকেট পঁচাত্তর পয়সা, সিনেমার টিকিট ফার্স্ট ক্লাস দু-টাকা দশ, ব্যালকনি দু-টাকা চল্লিশ পয়সা, বাংলার বোতল এগারো টাকা, গাঁজার পুরিয়া দু-টাকা। কলকাতায় বাসভাড়া যতদূর সম্ভব চল্লিশ পয়সা। টিউশনিতে স্যারেরা সপ্তাহে তিন দিন প্রায় আড়াই ঘণ্টা পড়িয়ে নিতেন চল্লিশ টাকা, দশ টাকা করে বাড়ানো ছিল, গোটা তিনেক সাকুল্যে মাসে তিরিশ টাকা, দিনে হাতখরচ দু-টাকা তাও সিগারেট খাওয়া ধরেই পনেরো দিনের মধ্যে বাড়িতে ধরা পড়ে যাওয়ায়, দৈনিক এক টাকা থেকে বেড়ে দু-টাকা হয়েছিল, বাবার মনে হয়েছিল "নইলে বিড়ি খাওয়া ধরবে" —যদিও তা-তে কেলিম কত্তা-র কলেজ বিড়ি[১] ঠেকানো যায়নি। বইমেলা বাবদ জমানো ছিল শ'খানেক, বাবা দিয়েছিল পঞ্চাশ, বই কেনার জন্যে বাবার পকেট-ঝেড়ে টাকা পনেরো। তাই নিয়ে দ্বিতীয় দিন বইমেলায় গিয়ে ওই বই নজরে আসে। সূচিপত্রের শুরুতে জ্যোতি বসু-র নাম দেখেই নাকটা কুঁচকে

[১] তিন লম্বা টানে শেষ হয়ে যায় এমন মাপের মসৃণ ত্বকের হালকা নেপানি তামাকের বিড়ি, আহা! কেলিম কর্তার ইন্তেকাল হয়েছে কতকাল আগে, আমার বুকে টোকা দিয়ে বলেছিল "দিনে দু-প্যাকেট বিড়ি খাও, এ বয়সে ভালো না, একটু দুধ-টুধ খেও।" কেলিম কত্তা-র কলেজ বিড়ি আর এই কথা, আমার কোনো খাতায় কবিতা হয়ে পড়ে আছে নিশ্চয়ই; তার কারণ কী, বা কে? মিরোস্লাভ হোলুব, হেনরি মিলার, পল ভ্যালেরি নাকি মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—নাকি স্বয়ং কেলিম কত্তা!!?

ওঠে[২], কিন্তু যেহেতু বই খুললে মাঝামাঝি থেকে পেছনদিক আগে চোখে আসে— সেখানে একগাদা চেনা নাম নেরুদা এলুয়ার আরাগঁ লোরকা রোবসন স্টেফান স্পেন্ডার-এর কবিতা পাবলো পিকাসোর ছবি, বুনুয়েল ব্রেখট্-এর অচেনা লেখা দেখে মাথার পোকা নড়ে যায় আমার। টোটাল বাজেটের হাফ-পয়সা চলে যাবে! সেসময় দু-শো পাতার ভালো বই পনেরো থেকে কুড়ি টাকা। তিরিশ বা চল্লিশ দামি বইয়ের তালিকায় পড়ত। সিগারেটের দাম এর সাথে তুলনা করলে মাথা খারাপ হয়ে

---

[২] জ্যোতি বসু-র নাম দেখে নাক কুঁচকে যাওয়াটা কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ছিল না। আমাকে তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাড়ে তিন-চার বছর বয়সে, একটা খিড়কি পুকুরের ঘাটে, কাদের বাড়ি মনে নেই, বনগাঁয়, মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুকুরের ওপারে নীচু আধভাঙা প্রাচীর, তারপর মাঠ, প্রাচীরের ধারে মঞ্চ, পাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল। তিনি উঠলেন, বেঁটে মতো একটি লোক, ধুতি-পাঞ্জাবি জহর কোট, কী বলেছিলেন কিছু মনে নেই। এটা হয় সাতাত্তরে ভোটের আগে অথবা পরে। মা কুড়ি বছর হল মারা গেছে, ভেরিফাই করার উপায় নেই। যাই শুনে থাকি না কেন, সেটাই শেষ; তারপর থেকে বারো-বছর জ্ঞানত তাঁকে কখনোই একটি সম্পূর্ণ বাক্য বলতে শুনিনি বা উদ্ধৃত হতে দেখিনি, অর্ধস্ফুট দেয়ালা ছাড়া। এইসময়েই বা ঠিক পরপর তাঁর সর্ববৃহৎ উক্তিটি ছিল বানতলা ধর্ষণকাণ্ড প্রসঙ্গে—"এরকম তো কতই হয়"। এখন বুঝি উনি স্রেফ 'ড্যাস্-লোক' ছিলেন না, একজন 'মহান দার্শনিক' ও বটে! নইলে তৎকালীন পরিস্থিতিতে ওই বাক্যস্ফুরণ অসম্ভব ছিল। (দার্শনিকেরা যে প্রায়শই ছোটোলোকের মতো কথা বলে ওঠেন সেটা তাঁদের সমসাময়িকরা ঠিকই বুঝতে পারেন, পরবর্তীকালে দর্শনের ছাত্ররা নয়, কারণ তখন সেগুলো তাঁদের এগিয়ে থাকার নমুনা হয়ে ওঠে। সক্রেটিস মার্কস নিৎসে হাইডেগার উদাহরণের কমতি হবে না) ওই সময়েই ভি.পি.সিং সূত্রে সিপিএম ও বিজেপির সখ্য। আজকের মোটাভাই দুজনের মহামানবত্বের নজির সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্যবেক্ষণ করে, আইটি সেল আর এলসি+এবিটিএ+কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে পাশাপাশি রাখলে সে যুগের বাঙালির মুখে মুখে প্রচারিত সমাজ-মাধ্যমের রূপটি বোঝা যাবে। "ভাঁইয়ো আউর বঁহিনো" নয় "বন্ধুগণ" থেকেই "মিঁত্রওও" আর "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" থেকেই বর্তমানের "ক্রোনোলজি" সমঝ্মে আসা সম্ভব।

যাবে, সাধারণভাবে আজকের দশ থেকে পনেরো গুণ অর্থাৎ এখনকার হিসাবে হাজার টাকার মতো। আমি বইটা কিনি না—বেশ অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে-চেড়ে আগামীর বিবেচনায় রেখে দিই। তাপু পাশে এসে জিজ্ঞাসা করে, "কী রে, এটা নিবি নাকি?" —"নাঃ রে! অনেক দাম!" তাপু "ওহ্" বলে বেরিয়ে যায় স্টল থেকে।

পরদিন সকালে তাপু বাড়ির সামনে থেকে হাঁক মারে—"নীচে আয়"। আমি নীচে গিয়ে গেট খুলতেই স্কুল-ব্যাগ থেকে বইটা বার করে আমার হাতে দেয়! "এই নে তোর তো লাগবে" —আমি চূড়ান্ত অবাক! "কিনলি!" "ধোৎ, তোর লাগবে তো, ঝেড়ে দিলাম"—বলে তাপু সাইকেলের প্যাডেলে চাপ মেরে চলে যায়।—এটা আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা যা সরাসরি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওই বইতে স্টিফেন স্পেন্ডারের গোটা দুই কবিতা ছিল, আর কয়েকটা কবিতা পড়বার পর যে স্টেফান স্পেন্ডারকে বছর-চার-পাঁচ পর নতুনভাবে চিনব, ওই শাহদাত-দার দোকানে *The God that Failed* বইটা কুড়ি টাকা দিয়ে কেনবার পর।

ওই *স্পেনের গৃহযুদ্ধ*-র পরই আমি দে'জ-এর ক্যাটালগে শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজে মানবেন্দ্রর অনুবাদে খুঁজে পাই মিরোস্লাভ হোলুব, ভাস্‌কো পোপা, চেসোয়াভ মিউস, নিকানোর পার্‌রাকে। যদিও বইগুলো বেরিয়েছিল কয়েক বছর আগে তবুও এগুলো একান্তই আমার আবিষ্কার, কারণ এই কবিদের নাম আমি আগে কারো কাছে শুনিনি পড়িওনি, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনুবাদে এঁদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। বছর

দুয়েক আগে কবিতার মতো কিছু লিখতে শুরু করা আমি, শুধু স্যার প্রকাশ্যে এত অসম্ভব প্রশংসা করতেন, যেটাকে শুধুমাত্র স্নেহান্ধ-প্রলাপ ছাড়া ওই বয়সেও অন্যকিছু ভাবা সম্ভব হয়নি, অন্য আর সবার কাছে এমনকি কবি বন্ধু-র কাছেও শুধুই দুর্বোধ্য আর অন্যরকম লাগত, আরও সাহসী হয়ে উঠি এঁদের লেখা পড়ে। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল হোলুবকে, যাঁর কবিতায় পড়লাম—

সন্দেহ নেই, কবিতা নেহাৎই এক খেলা।
সন্দেহ নেই, কবিতা শুধু বাঁচে তার জন্মের মুহূর্তে আর পড়ার মুহূর্তে,
আর খুব বেশি হলে স্মৃতির আলোছায়ার খেলাধুলায়।
সন্দেহ নেই, একই কবিতায় কেউই দু-বার প্রবিষ্ট হতে পারে না।
সন্দেহ নেই, কবি গোড়া থেকেই আন্দাজ পেয়ে যান যে
কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর নেই,
যেমন বলেছেন হেনরি মিলার।

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়ে

আলবার্ট আইনস্টাইন আলোচনা করিতেছিলেন—
(কী বলিতে হইবে, তাহা আবিষ্কার করাকেই তো বলে জ্ঞান)—
আলোচনা করিতেছিলেন
পল ভালেরির সঙ্গে,
জিজ্ঞাসা শুনিলেন :
হের আইনস্টাইন, আচ্ছা, আপনি আপনার
চিন্তাদের লইয়া কী করেন? মাথায় গজাইবামাত্র লিখিয়া ফেলেন?
নাকি সন্ধ্যাবেলা অব্দি অপেক্ষা করেন? কিংবা সকাল অব্দি?
আলবার্ট আইনস্টাইন উত্তর দিলেন :
মঁসিয় ভালেরি, আমাদের ব্যবসায়ে
চিন্তারা এতই দুর্লভ

যে যখন কারু মগজে কোনো চিন্তা উদয় হয়
আপনি কিছুতেই তাহাকে ভুলিতে পারিবেন না।
এমনকী এক বছর পরেও না।

তখন জানতাম না আদৌ হেনরি মিলার ওরকম কী কথা বলেছিলেন বা ভ্যালেরি আর আইনস্টাইনের গল্পটা আদৌ সত্যি নাকি নেহাতই কল্পিত কবিতা। সে-সময় জানা সম্ভবও ছিল না।[৩]

মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতার শেষে 'রক্ষাকবচ' নামক এক গদ্যাংশ ছিল, যেমন মিউশ বা পোপা-তে, সেই অংশগুলোর নামকরণ আর শেষে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না-থাকায় পড়ে বুঝতে হত সেগুলি অনুবাদকের বক্তব্য। সেগুলি কবিতা সম্পর্কে আমার ধারণা তৈরি হবার সময়ে বিশেষভাবে ছাপ ফেলেছিল। এই লেখাগুলিতে আলোচ্য কবিরা একে অপরের সাথে অদ্ভুত ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, মানবেন্দ্র এইসব কবিদের সম্পর্কে পাঠককে জানাতে গিয়ে প্রায় সমসাময়িক এক কাব্যতত্ত্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন যেন। মনে হয় না, আলাদা করে এই কবিদের Selected Works পড়লে এই উপলব্ধি এত সহজে হত। প্রকৃত শিক্ষকের মতো তিনি পৌঁছে দেন এক নতুন কবিতার জগতে, যতটা কবিতাগুলির মাধ্যমে তারচেয়ে ঢের বেশি তাঁদের কাব্য-জগতের সংক্ষিপ্ত ধারাভাষ্যের মাধ্যমে।

---

[৩] হেনরি মিলার তাঁর নিজের লেখার মাঝে এত কথা বলেছেন লেখালিখি আর কবিদের নিয়ে, এরকমও বলেছেন হয়তো; পরেও চিনতে পারিনি দেখে। তবে হেনরি মিলারের *The Time of the Assassins*-এর মলাটে দ্বিতীয়বার 'র‍্যাঁবো'-র নাম চিনতে ভুল হয়নি, সেখানে ভ্যালেরি কুড়ি বছর কবিতা ছেড়ে গণিত-চর্চা করেছিলেন লেখা ছিল আর ভ্যালেরি আইনস্টাইনের গল্পটার আভাস কয়েক লাইনে বহু বছর পরে লেখা বই Bill Bryson-এর *A History of nearly Everything* এ পেয়েছিলাম।

হয়তো পরিণত পাঠকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তবু আমি সেই জগতের একটা আদল তাঁর লেখা থেকেই তুলে আনব, আমাদের বেড়ে ওঠার সময়ের রসদগুলির পরিচয় দিতে। যদি এখন সেই বয়সি কেউ পড়ে এই লেখা, হয়তো উত্তেজিত হবে সে আমাদের মতো, হয়তো জীবনটাকে বাকি পৃথিবীর চোখে বোকার মতো খরচ করে ফেলতে উৎসাহী হবে, এই আশায়, কেননা সত্য বারবার সাবধানীদের কাছে হেরে গেলেও সেই এ পৃথিবীর জীবনরস।

মিউশ আর হোলুব সম্পর্কে লেখা দুটি শুরু হয়েছিল Dachau, Auschwitz কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প প্রসঙ্গে আডোর্নো-র উক্তি— "দাহাউ-আউশভিচের পর আর কবিতা হয় না" —এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম' যখন প্রায় গল্প-ইতিহাস হয়ে গেছে, 'হেই সামালো ধান হো' আর 'উই শ্যাল ওভারকাম' একটি পার্টির সম্পত্তি-পরিচিতি হয়ে উঠেছে, আমেরিকা গালফ্ ওয়ার আরম্ভ করে সারা পৃথিবীর শত্রুরূপে চিহ্নিত আর আমেরিকা পোষিত ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ায় সিনেমা উপন্যাস মানেই অ্যান্টিক্রাইস্ট নাৎসি হিটলারের ইহুদিদের উপর অত্যাচার আর ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কথা, সেই সময়ে মানবেন্দ্র কত অনায়াসে আমাদের পোস্ট-কলোনিয়ালিটির মূল কথাটা ধরিয়ে দেন, যা কলেজ পড়ুয়াদের সাধের লব্জ হয়ে উঠবে আরো বছর-দশেক পরে। মানবেন্দ্র বলেন, "যেন দাহাউ-আউশভিচ-বুশেনভাল্ডে যা ঘটেছিলো, তা সম্পূর্ণ অভিনব কোনো ব্যাপার। যেন গ্রীসের সভ্যতার ভিৎ ছিলো না ক্রীতদাস। যেন এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় নৃশংস ও নির্বিচার জাতি

হত্যা হয়নি। যেন পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী (ও এখন বুর্জোয়া পুঁজিবাদী) সভ্যতা কেড়ে নেয়নি উপনিবেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি। কত শ্বেতাঙ্গ মরেছিলো ইওরোপের মহাসমরে? আর কত মানুষ মরেছিলো এই-সব উপনিবেশে?

আডোরনো মার্কসবাদী—ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ধুন্ধুমার প্রবক্তা—ইউরো-কমিউনিজ়ম্ ব্যাপারটার অন্যতম উদ্যোক্তা। কিন্তু কোথাও একটা খিঁচ থেকেই যায়। শুধু দাহাউ-আউশভিচ হ'লেই তাঁর মনে হয় পশ্চিমী সভ্যতার গড়নটাতেই কোনো মস্ত গণ্ডগোল থেকে গিয়েছে—যেন এই গণ্ডগোল বোঝা যায়নি ১৪৯২তে কলম্বাস যখন ভারত ভেবে আমেরিকায় পা দেন, ভাস্‌কো-ডা-গামা তারপর আসেন ভারতবর্ষের রাস্তায়। আসলে গোপাল ভাঁড় যে বলেছিলেন, অন্ধকারে ধাক্কা দিলেই সব মোহান্তেরই টনক ন'ড়ে যায়, সত্যি ক'রে বোঝা যায় কে কী-রকম, তা একেবারে মর্মান্তিক সত্য কথা।"

আউশভিচ থেকে একেবারে ঘরের লোক 'গোপাল ভাঁড়'!! —ষোল-সতেরো বছর বয়সি পড়ুয়া-বদমায়েশদের কতটা আলোড়িত করতে পারে আজ হয়তো আর বোঝা সম্ভব নয়। আরেকটি ছিল এমন বই, অশ্রুকুমার শিকদারের *নবীন যদুর বংশ*, বিদেশি উপন্যাসের আলোচনা, যা গড়ে দিয়েছিল জেদ, পড়তেই হবে পড়তেই হবে এইসব সব কিছু—ছোটো থেকে বড়ো হয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারে, এক ফিকশনাল মানুষ 'পাঠাগার মাস্টারমশাই'-এর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে, রেস্ট্রিকটেড আলমারির ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত ২৪ খণ্ডের *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প ও উপন্যাস* পড়তে

দিয়েছেন ক্লাশ নাইনে উঠতেই নিজের কার্ডে ইস্যু করে, তারপর স্যার সুদর্শন গুপ্ত শেখাচ্ছেন উসকানি দিচ্ছেন ইংরেজিতেই সেসব আবার পড়তে বুঝতে, নিজের লেখা পড়ে শোনালে পাল্টা শোনাচ্ছেন তাঁর পছন্দের নীৎশে লিখিত প্যারাগ্রাফ, কবিতায় পাউন্ড-এলিয়ট; আর মানবেন্দ্র দিচ্ছেন 'রক্ষাকবচ'—"আজকে, তাহ'লে, চাই কবিতার বদলে অন্যকিছু,—কবিতার উলটোটাই, তার বিরুদ্ধপক্ষ, তার সর্বনাশ (তার মুক্তি), অন্যরকম কোনো কিছু, 'পদলালিত্য ঝংকার মুছে-ফেলা কথা, গলার মধ্যে বিঁধে-যাওয়া কোনো কাঁটা, অন্যরকম কোনোকিছু, বিস্বাদ, বিরস, বিসদৃশ—অর্থাৎ অ্যান্টি-কবিতা, ... প্রতি কবিতা, চাই কী, অকবিতাও। কাকে বলে কবিতা, যদি তা না-বাঁচায়। দেশ অথবা মানুষ', যেমন জিগেশ করেছিলেন পোলাণ্ডের চেশোয়াভ মিউশ। যেহেতু কবিতা—এতকালের কবিতা—বাঁচায়নি কাউকে না দেশ, না মানুষ সেইজন্যেই তবে চাই এমনকিছু যে মানুষ দেশ ভাষা—এইসবকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। [...] কিন্তু এটাই মনে রাখা চাই যে, কী একটা যেন বদলে গিয়েছে পৃথিবীর কবিতায়—দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, বিশেষত। শুদ্ধ কবিতার বিরুদ্ধে জিহাদ অবশ্য শুরু হয়েছে—পরাবাস্তববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদি আন্দোলনের কথা কে না জানে। তাছাড়া বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট যেমন জার্মানিতে, হিউ ম্যাকডেয়ারমিড যেমন স্কটলাণ্ডে, তেমনি কিউবায় নিকোলাস গ্যিয়েন, পেরুতে সেসার ভায়েহো, চিলিতে পাবলো নেরুদা শুদ্ধ কবিতার বিরুদ্ধে অনবরত ও অবিশ্রাম লড়াই চালিয়েছেন। এটা নেহাৎই কাকতাল নয় যে নেরুদা একবার পার্‌রার সঙ্গে মিলে যুগ্মভাবে একটি বই লিখেছিলেন।

হোলুব, তাই, একা নন। আমরা পর-পর নাম করে যেতে পারি পাশ্চাত্ত্যের প্রধান কবিদের, যাঁরা এই প্রতিকবিতার প্রবক্তা। পোলাণ্ডে জবিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট আর তাদেউশ রুজভিচ, ইউগোস্লাভিয়ায় ভাসকো পোপা আর ইভান লালিচ, হাঙ্গেরিতে ইয়ানোস পিলিনশ্‌কি, জার্মান ভাষায় হান্স মাগনুস এন্‌ৎসেন্‌স্‌বারগার আর পেটার হান্‌ট্‌কে, ইংলণ্ডে এড্রিয়ান মিচেল—এমনি অনেক নাম নিশ্চয়ই মনে প'ড়ে যাবে পাঠকদের। প্রধান একটা সাদৃশ্যসূত্রও হয়তো আবিষ্কার করা যাবে এঁদের মধ্যে। বিশেষত মনে প'ড়ে যাবে এই কবিদের শ্লেষ-পরিহাসের রণকৌশল। এই শ্লেষ কোনো শৌখিন বিরক্তি বা বীতরাগ থেকে আসেনি— যেমন হয়তো পাওয়া যায় টি-এস এলিয়টে।" (*মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ১৯৮৫, পৃ ১৫৬)

মানবেন্দ্র পর-পর নাম করে গেলেন, বললেন পাঠকের মনে পড়ে যাবে, জানি না সে কোন্ পাঠক, তেমন কাউকে সশরীরে দেখিনি তখনও না, পরেও না। হাল খারাপ হল তার যে প্রথম পড়ল—শুরু হল এমন এক খোঁজ যা কখনই শেষ হবার নয়! তার কাছেও হয়ে উঠল 'পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল'।

personal is political

চেশোয়াভ মিউশের কবিতা প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র লিখেছিলেন, "কোনো কবিতাই শেষ অব্দি আমাদের কাছে কোনো কথা বলে না, যদি-না সে নিজের কালকে উন্মোচিত করতে পারে বা চায়। আর মিউশের এই কবিতাগুচ্ছ আসলে তাই —পর্দা অপসারণ, যবনিকার উন্মোচন —তার চাইতে বেশি কিছু নয়, কিন্তু ন্যূন-কিছু

আকাট
রুটি আর ভালোবাসার দৃশ্যনিচয়
এডওয়ার্ড বন
স্তানিসোয়াভ লেম
মুখোশ ও মৃগয়া
মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা
অনুবাদ / মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাৎস্লাভ হাভেল
মনঃসংযোগের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা
ভূমিকা ও অনুবাদ
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চেসোয়াভ মিউশ
শ্রেষ্ঠ কবিতা
অনুবাদঃ
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মনঃসংযোগের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা
ভাসকো পোপার
শ্রেষ্ঠ কবিতা
ভাসকো পোপার শ্রেষ্ঠ কবিতা
অনুবাদ / মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা / অনুবাদ / মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চেসোয়াভ মিউশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়। [...] মিউশের কবিতা আসলে তো কবিতা যারা পড়ে না তাদের জন্যই লেখা কবিতা—আর সেই কারণেই তা অস্বীকার করে রবার্ট ফ্রস্টের ফতোয়া, যে, অনুবাদে যা হারিয়ে যায় তা আসলে কবিতা স্বয়ং।" তাই মানবেন্দ্রর তরজমায় হোলুব আমার কাছে একটুও হারিয়ে যান না যখন তিনি লেখেন—

যদিও শিল্প কোনো সমস্যার সমাধান দেয় না,
বরং জামার মতো গায়ে দিয়ে দিয়ে
তাকে জীর্ণ করে ফেলে, যেমন বলেন সুজান সনটাগ;
তবু কবিতা একমাত্র তরোয়াল ও ঢাল;
কারণ কবিতা আসলে স্বৈরাচারী, স্বতশ্চল শকট, উন্মত্ততা, কর্কটরোগ
বা মৃত্যুতোরণের প্রতিপক্ষ নয়
—বরং কবিতার লড়াই তারই সঙ্গে যা সবসময়েই ছিলো
—ভিতরে-বাইরে সবসময়, সামনে-পিছনে সবসময়,
মাঝখানটিতে সব সময়—
সবসময় যা আছে আমাদের সঙ্গে আর আমাদের বিরুদ্ধে।
কবিতা শূন্যতার বিরোধী। শূন্যতার মধ্যে কবিতাই অস্তিত্ব।
তার যুদ্ধ সহজাত ও হাত ফেরতা শূন্যতার বিরুদ্ধে—
প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শূন্যতার বিরুদ্ধে। (হোলুব পৃ ৬৭)

যদিও কবিরা তখনই সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠেন, যখন স্বাধীনতা, খাদ্যপ্রাণ-গ, যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রচারযন্ত্র, নানা বিধিনিষেধ ও জরুরিঅবস্থা এবং অতিউত্তেজনাসারানোর চিকিৎসারও সবচেয়ে প্রয়োজন; যদিও শিল্পী হওয়া মানেই ব্যর্থ হওয়া আর শিল্প ব্যর্থতারই বশংবদ— যেমন বলেছেন স্যামুয়েল বেকেট; কবিতা, তবু, মানুষের শেষ কাজগুলির নয়, প্রথম কাজগুলির অন্যতম। (*মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা* পৃ ৬৫)

মানবেন্দ্র মিউশের নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রসঙ্গে যে ভাষায় তার স্বরূপ উন্মোচন করেন তার তুলনা লিখিত ভাবে বঙ্গভাষায় আছে কিনা সন্দেহ— "মিউশ বিশ্বাস করেন না যে কবিতা নিছকই কব্জির কলাকৌশল দেখাবার উপায়, আত্মরতির মাধ্যম, বা সে নেহাৎই উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া। কবিতা নিস্পৃহ নয়, বিবাগী নয়, বরং অসহায়ভাবে জীবনলোলুপ; 'কবিতাই জীবন, জীবন কবিতা'—এমন পঙ্‌ক্তি স্মরণীয়ভাবে অর্থ বহন করে কেবল তখনই যখন কোনো কবি বলেন,

কাকে বলে কবিতা, যদি তা না-বাঁচায়
দেশ কিংবা মানুষকে ?

এই উচ্চারণ নিশ্চয়ই নির্লিপ্তি বা ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে দৃপ্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

অতএব, এটাই পরিহাস যে মিউশ ১৯৮০তে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। [...] তাঁর নিজের ধারণা এই যে তাদেউশ রুজেভিচ, জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবর্ট বা ইয়েশি হারাসিমোভিচ কবি হিশেবে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ও স্মরণীয়। অন্তত এটা তিনি মুখে বলেছিলেন, যখন ১৯৭৪-এ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, যখন তিনি কবিতা পড়তে এসেছিলেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভ্যানকুভারে। অতএব রুজেভিচ বা হেরবের্ট-এর বদলে তিনিই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—এ-কথা জেনে তাঁর চেয়ে বেশি তাজ্জব বোধহয় আর-কেউই হননি।

অথবা খুব-একটা তাজ্জবও বোধহয় হননি, কেননা তিনি মোটেই কোনো নির্বোধ লেখক নন, এবং/উপরন্তু, ছিলেন

বৈদেশিক দপ্তরে, সমাজতান্ত্রিক পোলাণ্ডের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিশেবে পারী আর ওয়াশিংটনে—স্বভাবতই ধ'রে নিতে হয়, তিনি জানেন নোবেল পুরস্কার সমিতি যতই ন্যাকা বা সাধু সাজুক, তাদের সবগুলো শিরোপা নিছক সাহিত্যিক কারণে কোনো লেখকের ওপর বর্তায় না। [...] আসলে, আমরা তো জানি যে চেখভ, বা তলস্তয় বেঁচে থাকা সত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার পাননি, গোর্কি পাননি, কিন্তু পেয়েছিলেন ইভান বুনিন। এন্‌গুগি ওয়া থিয়ং'ও পুরস্কার পান না, সেম্বেন উসমান পুরস্কার পান না, অথচ পুরস্কার দেয়া হয় ওলে শায়িঙ্কাকে।

আসলে যদ্দিন কোনো বুর্জোয়া পুঁজিবাদী দেশ এই পুরস্কার দেবে—নোবেল পুরস্কার নিয়ে কেলেঙ্কারি ততদিন ফুরোবে না। তার মানে আবার এটাও নয় যে এরা কখনো সত্যিকার ভালো লেখককে পুরস্কার দেয় না।

[...] কিন্তু আজ এটাই পরিতাপের বিষয় যে মিউশ নিজেই ইতিহাসের ক্রুর পরিহাসের শিকার। যেহেতু এককালে তিনি ছিলেন, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পোলাণ্ডের কূটনৈতিক দপ্তরে সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধান, (তিনি ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোয় সেইভাবেই কাজ করেছিলেন); ১৯৫১ সালে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তুঙ্গ মুহূর্তে তিনি পশ্চিমী দেশগুলোর কাছে আশ্রয় চান। এইজন্যে নয় যে মার্কসবাদ তিনি মানেন না, কিন্তু নিজের দেশে লাল ফিতে আটকানো আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একশিলা তার মনঃপূত হয়নি। অতএব নিজেদের দেশের 'তথাকথিত দুর্বিপাকের' সঙ্গে লড়াই না-করে তিনি আশ্রয় নেন মার্কিন মুলুকে, দেশান্তরে, আর মার্কিন মুলুকও

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সেই জমজমাট দিনগুলোয় সোৎসাহে তাকে আশ্রয় দেয়। এখন তিনি বার্কলেতে ক্যালিফরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাভ ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। যে-মিউশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর অঙ্গীকারবদ্ধ কবিতায় সুবিধাবাদী ও দ্বিজিহ্ব মানুষদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রূপে ভ'রে উঠেছেন, সময়ের পরিহাসে, পোলাণ্ডের আরেক দুঃসময়ে, তিনি নিজেই সেই অবস্থার শিকার হলেন—যেমন একবার হয়েছিলেন রুশ দেশের বোরিস পাস্তেরনাক।"

আমি এখনও নিশ্চিত যদি কোনো লিখিয়ে বা লিখতে চায় এমন কেউ, ওই লেখায় শুধুমাত্র চোখ না বুলিয়ে সত্যি-সত্যিই পড়ে, (পড়া খুব শক্ত ব্যাপার, অধিকাংশ মানুষ লেখা দ্যাখেন বা চোখ বোলান; আর সেটাকেই ভাবেন পড়া) যদি মাথায় নেয়, প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয়ে ওঠা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। এটা বোঝার আগেই যে, প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার উৎস আর পরিপুষ্টি উভয়ই প্রতিষ্ঠানের বাইরেই থাকে, নিজের মাঝে। মানবেন্দ্র হোলুব সম্পর্কে লেখেন, "হোলুব তাঁর কবিতাকে বর্ণনা করেছেন 'পুরোপুরি খোলামেলা কবিতা' বলে; তাঁর কবিতার গড়ন আর ভঙ্গি এতই প্রত্যক্ষ, অব্যবহিত ও সোজাসুজি যে কোনো রোগাপটকা ন্যাকা-বোকা বিষয়-বস্তু তার মধ্যে টিকতেই পারত না।" আর আমার কবিতা সেই বয়সে পুরোপুরি খোলামেলা হয়েও বন্ধুদের কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল, অবশ্য সেসব কিছুর ব্যাখ্যা তারা ভালোই দিত, কব্‌তের কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও মেয়েকে আবিষ্কার তারা ঠিকই করে ফেলত, এমনকি শুয়োরের চিত্রকল্পেও। এবং তুমুল খিল্লি, হুটোপাটা হৈ-হল্লা!

ওই বয়সে স্কুল-কলেজে আমরা একদল নাটক নিয়ে খুব মেতে উঠেছিলাম। সাধারণ প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়াও বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার মূলত চিত্তদার উদ্যোগে 'তীরন্দাজ'-এর অনুশীলন, নিজেও করেছি ছোটো নাটকের অনুবাদ। এইসবের মাঝে ওই সময় পেয়েছিলাম তৎকালীন চেকোস্লাভিয়া প্রেসিডেন্ট ভাৎস্লাভ হাভেল লিখিত অলিন্দ-নাটকের মানবেন্দ্রকৃত অনুবাদ প্যাপিরাস প্রকাশিত 'মনঃসংযোগের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা', তার শেষে হাভেল-এর নাটক প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র লিখেছিলেন 'বিদূষক বাচস্পতি' নামে এক অসাধারণ নিবন্ধ।[৪]

এইসব এবং আরো অনেককিছু মিলেমিশে বছর চারেক পর, একুশ হবার একটু আগেই 'দৈনন্দিন' নামে একটা কবিতার কাগজের আইডিয়া আমার মাথায় আসে—যাতে সকলেই লিখবে আঁকবে, যেমন খুশি, তাদের ভাবনা চিন্তা কবিতা মতামত—সেসব কিছুকেই আমরা কবিতা বলব; আর যেটা সত্যিই দেখতেও হবে খবরের কাগজের মতো। যার দুটো 'ইয়ার'-এ লেখা থাকবে—হোলুবের, 'কবিতা হবে খবরের কাগজের মত', আর মিউশের, 'কাকে বলে কবিতা যদি তা না বাঁচায় দেশ কিংবা মানুষ'। সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন করে

[৪] পরে ছোটোদের বইয়ের অনুবাদও কিনেছি শুধু মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত জেনে। এমনকি ২৫তম জন্মদিনে স্বরূপ (দত্ত?) একটা বই উপহার দিতে চাইলে দে'জ থেকে দেশ-বিদেশের *শিশুসাহিত্য*-১, মানবেন্দ্রর অনুবাদে স্তানিশোয়াভ লেম-এর *পৃথিবী কি করে বাঁচল*, নিয়েছিলাম—তার আগে প্রায় বছর-তিনেক কফি হাউসে নিয়মিত নীৎসে, সার্ত্র, আডোর্নো, হেবারমাস কপচানো শুনতে অভ্যস্ত স্বরূপ প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে প্রথম পাতায় লিখে দিয়েছিল "সৌম্য-কে (অনিচ্ছায়) / স্বরূপ"। বইটা আছে; আর স্বরূপকে আমার মনে আছে কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের *শ্যামার ঘরে চারদিন* পড়িয়েছিল বলে।

ছাপা হবে—

যে কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোন মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায় কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসেবে পাঠান
যেকোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসেবে গণ্য
তা যদি হয় কোন রাজনৈতিক নেতাকে সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদনপত্র
বা স্রেফ মজার কথা
অথবা কোন নিজস্ব ইস্তাহার বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা তবুও।

বন্ধু-বান্ধব সঙ্গী-সাথী সকলেই যারা ছিল পূর্বতন সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দলে অথবা বাইরেও, সবাই বিনা-প্রশ্নে অত্যন্ত উৎসাহী-উত্তেজিত হয়ে ওঠে এই অদ্ভুত পরিকল্পনা আর তার 'ইস্তেহার' শুনে, যে যার সাধ্যমতো চেষ্টা করতে প্রতিশ্রুত হয় যাতে কাণ্ডটা ঘটিয়ে ফেলা যায়। বর্তমান 'হরপ্পা'-সম্পাদক ছিলেন সেই উদ্যোগের পুরোধা। কিন্তু এই পরিকল্পনার কথা শুনে সেকালের কৃষ্ণনগরের লেটারপ্রেস আঁতকে ওঠে! তার আগে ছাপার অভিজ্ঞতা বলতে কলেজ ম্যাগাজিনের তত্ত্বাবধান করা। কলকাতায় খোঁজখবর করে দেখা যায় চার-আট পাতার হাজার কপি যার দাম হবে দু-টাকা, এরকম খবরের কাগজ ছাপবার মতো কোনো প্রযুক্তি নেই, যা আছে তা সেই জেলার সংবাদপত্রের মতোই। লাইনোটাইপে এরকম খুচরো কাজ কেউ করে না, আর ফটোটাইপ সেটিং বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ, হাফটোন ছবি ছাপা তো দুর, লাইন-আর্টেই অশান্তির শেষ নেই! রোজ যে

খবরের কাগজ দেখি, বিদেশি ছবির বইয়ের পাতা ওলটাই, সেটা ছাপা যে এত চক্কর কে জানতো! আর ওই যুগেও কলেজস্ট্রিটে প্রিন্টিং-বিশারদ গিজগিজ করতেন, কিন্তু ছোকরাদের আবদার শুনে তাঁরা হয় হাঁ নয় ধাঁ; আর নয়তো আগডুম-বাগডুম বকে আরও গুলিয়ে দিলেন। ওদিকে তিন-তিনটে ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজন উৎসাহী হয়ে গেছে, তারা কবিতার চেয়ে রাজনীতি-টায় উত্তেজিত বেশি! তখন কলকাতায় সদ্য ডিটিপি চালু হচ্ছে দু-এক জায়গায় টুকটাক, কিন্তু এসব কাজ তখনও চালু হয়নি, PTS আর ব্রোমাইড-এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে! অগত্যা আমি ম্যাথমেটিক্স অনার্স স্থগিত রেখে প্রিন্টিং-এর ব্যাপারটা শিখতে চলে আসি কলকাতা, এই বিশ্বাসে যে নিজের রোজগার ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারব, এবং ছবি আঁকতে পারার সুবাদে ঢুকে যাই এক আধা বিজ্ঞাপন সংস্থায় ভিসুয়ালাইজার হয়ে। এরপরের ঘটনা লিখতে গেলে কলকাতার প্রিন্ট-হিস্ট্রির সবচেয়ে গোলমেলে পরিবর্তনের সময়ের ইতিহাস লিখতে হবে। সে থাক। অবশেষে সে কাগজ মাস-আটেক পর প্রথম প্রকাশিত হয়, ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতি’তে পুরোটাই হাতে লিখে, প্রথম সংখ্যা ট্রেসিং-পেপেরের উপর রোটারিং পেন দিয়ে গ্রেন-প্লেটে, অত্যন্ত হতাশ হয়ে পরবর্তী সংখ্যা ফিল্ম করে অফসেটে। এবং তৎক্ষণাৎ সেটা সিপিএমের কাছে নকশাল আর নকশালদের কাছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। সেখানে নিয়মিত কবিরা ‘স্টাফ রিপোর্টার’ হিসেবে যৌথভাবে লিখতেন নিজেদের কবিতার স্বত্ব ত্যাগ করে। সে কাগজ মনে করত, ‘সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়’, ঘোষণা করেছিল ‘শিল্প

হল যুদ্ধ, পিঠ বাঁচানো চলে না', হতে চেয়েছিল সেই প্রজন্মের 'সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র', একটিই শর্ত ছিল কবিতাকে হতে হবে সৎ অর্থাৎ কবির জীবনের মত, বাতেলা বা বানানো কথা নয়। 'দৈনন্দিন', কী পেরেছিল কী পারেনি সে গবেষণা বাদ দিয়ে এটুকু বলা যায়, 'কবি'-রা প্রচণ্ড খেপে গেছিলেন এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে—আজ ফেসবুকের যুগে যেখানে বাংলা কব্‌তের মূল মাধ্যম ফেবু, সেদিনের সেই বিরোধ কিছুতেই বোঝানো যাবে না। আর কিছু না পারুক 'যা কিছু ব্যক্তিগত তাই-ই রাজনৈতিক' এই মতের নমুনা হিসাবে কয়েকজনের কিছু-সময়ের জার্নাল অবশ্যই হয়ে উঠতে পেরেছিল 'দৈনন্দিন'। বিশ্বসাহিত্যের বিচারে সে পত্রিকা বিশেষ কিছুই না হলেও, সব 'ইজম' 'গুলকে খাওয়া' বাংলা আঁতেলদের প্রতিক্রিয়া অসাধারণ ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক একটি নমুনা আছে, দ্বিতীয় সংখ্যাটি বাইরের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী হয়তো 'আজকাল'-এ দিয়েছিল, সেখানে সমালোচনা লেখা হল, "কবিতা হবে, খবরের কাগজের মত—মিরোশ্লাভ হোলুব যখন এ কথা বলেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার আধুনিক কবিকুলের কথাটা তাঁর মাথায় ছিল না। থাকলে অমন একটা মন্তব্য করার আগে তিনি অন্তত দু'বার ভাবতেন! আর তা হলে তাঁর কথাটাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে 'দৈনন্দিন'-এর মত কোনও কবিতার কাগজ প্রকাশনার পরিকল্পনাও কেউ করতেন না এবং এই প্রতিবেদককেও কষ্ট করে তার প্রাপ্তিস্বীকার লিখতে বসতে হত না। 'দৈনন্দিন' কবিতা নিয়ে নিরীক্ষা করতে চায়, নাকি ঠাট্টা, সেটাই আসলে পরিষ্কার নয়। এক সঙ্গে অনেকগুলো কাঁচা হাতের ছেলেমানুষী

কবিতা, সম্পাদকীয় স্তম্ভ বা নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন আকারে সাজিয়ে দিয়েই প্রকাশক-সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই কবিতার দুনিয়ায় বিপ্লব এনে ফেলার স্বপ্ন দেখেন না। এমনকি পাঠককে চমক লাগানোর জন্য যে সপ্রতিভতার দরকার, সেটাও তাঁদের নেই। ওপরচালাকিও একটা শিল্প, যদি চর্চাকারী প্রকরণ দক্ষ হন। আশা করি, 'দৈনন্দিন'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি কবিতার কাগজ-এর বদলে কবিতা হয়ে ওঠার চেষ্টাই করবে।"

অথচ মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা-র 'রক্ষাকবচ' অংশটি মানবেন্দ্র শেষ করেছিলেন এই বলে—"বাংলায় হোলুবকে উপস্থাপিত করতে পারা আমার শুধু সৌভাগ্যই নয়, গর্বের বিষয়। হোলুবের এই কবিতা থেকে এখনকার বাংলা কবিতা অনেক কিছু শিখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। [...] এই অনুবাদগুলো গত বারো বছরে 'পরিচয়', 'হরবোলা', 'বিভাব', 'কালপুরুষ ও স্পন্দন'-এ বেরিয়েছে। হোলুব বলেছিলেন, কবিতা হবে খবর কাগজ পড়ার মতো কিংবা হয়তো ফুটবল খেলা দেখতে যাবার মতো অভিজ্ঞতা: অনায়াস, প্রাত্যহিক, জরুরি—যেমন হয় ছোটোহাজরির টেবিলে খবরকাগজ; অথবা যেমন হয় ফুটবলের মাঠে, বাইশ জনের দক্ষতা ও শিল্পিতায় ফেটে পড়ে বাইশ-হাজার বা তারও বেশি দর্শক—সে নিজে খেলে না বটে, কিন্তু জানে ও উপভোগ করে নৈপুণ্য ও কলাকৌশল, তার থাকে পক্ষপাত, প্রিয়দল, চেঁচিয়ে-ওঠা তারিফ অথবা উদ্দীপক উশকানি। এই বইয়ের কবিতাগুলো নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দেবে হোলুবের এই ভাবনার পেছনকার শর্তগুলো কেমন এবং কতখানি সঠিক।"

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৯৫ প্রচারসংখ্যা ২০০০ মূল্য : দুই টাকা

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

বিজ্ঞান কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার :

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তা
বিজ্ঞানহীন দেশে
হেতু বিজ্ঞান আমদানী :
দেশী-বিদেশী ডিগ্রি,
অনুকরণীয় বিলাস,
হঠাৎ বকাবুক
পরিশ্রমের ঘুম বার বার ভাঙে।
যাদের জন্য বিজ্ঞান তারা অনিশ্চিত
আবারনের প্রবেশ নিষেধ
এরপর শুরু
রক্তদান,
উদ্বৃত্ত খাতে দান,
অত:পর অপেক্ষা এবং
স্বপ্ন :
অথবা কোন বেণুদানীর শতবর্ষ
ও বিজ্ঞান কংগ্রেস........

বিধায়ক খুন

হস্তিনাপুরের
পৌরসভার সাথে সাথে
প্রজাদের সরকারী বামপ্রান্তেও
উজ্জ্বল হচ্ছে কর্মসূচীর প্রয়োজনে
কি ভাবে সাজো তহবিল
কী যৌবনিক ইন্ধানিং বেনোজল ব্যক্তিজীবনেও
কি আশ্চর্য! অইবেলা এসো
আমরা রাজপুরুষেরা
কলাম্মাছি
আজি
সংস্কৃতি রাজ্যে এমনভাবে নিরাপত্তাহীনতা
হে মে ও
বি ঠি
দু
খুক ময়লা অন্দরের গল্প
শেষ
হো:হো:

FORMING PRAYERS TO BROKEN STONE — Saumyadeep

আলজিয়ার্স : মৌলবাদীদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : কোনো মৌলই বাদ নেই, তবু মৌলবাদী আছে দেশে এবং বিদেশে। (দেশপ্রেম নামক মৌলটিকে আপাতত পার্যায়সারণীর শেষপ্রান্তে নিষ্ক্রিয়তায় রেখে দেওয়া যাক)।
কোনো নির্বাচিত দলকে সরিয়ে মিলিটারী শাসন কায়েম?!
অন্যায় অন্যায় অন্যায় ধু-উ-ব অন্যায়
আর সেইদল 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট' যখন একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালায়
॥ অন্যায় অন্যায় অন্যায় ধু-উ-ব অন্যায়
অন্যায়-নয়-ন্যায় কোনটা ?
বুঝতেই পারি না নিরপেক্ষতার নিষ্ক্রিয়তার ভাঁওতাবাজীর শিক্ষাশেষে
তবু বার বার চোখ চলে যায় মৃত তালিকায়
= –আটষট্টি জন বিদেশী, দু'জন দেশীয় অনুরাগিনী।
কুড়িজন আংবাদিক, ছয়জন বুদ্ধিজীবী
(যাঁরা কলম ধরেছিলেন মৌলবাদের বিরুদ্ধে)
আর তক্ষুনি
নিহত অজ্ঞাতক সপ্তাহে জিয়ানে আর আংবাদিক মঃ বেনশোর বর্তমান হয়ে ভর করেন আমার ঘাড়ে
আহ্ ... কলমের ঢাকনিটা....... এক্ষুনি ওটা চাই....... এক্ষুনি

চারজন CPIML কর্মীকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা

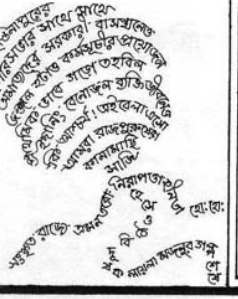

স্টাফ রিপোর্টার : কমলনা ২৯শে ডিসেম্বর
ওরা সবাই জানে ওরা কি করছে
আমরা সবাই জানি আমরা কি করছি
ওরা যা করছে তা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য
আমরা যা করছি তা ক্ষমা করার যোগ্য
আমরা ওদের ক্ষমা করছি প্রতিবাদ ক্ষমতাহীন
বলেই; ঈশ্বর সকলকেই ক্ষমা করবেন
কারণ আমরা সকলেই তাঁর পুত্র
রাজা আমাদের কোনো রাজাকে ক্ষমা করবেন
না, কারণ তিনি শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন
আমরা কিছু এপিটাফ লিখে দেব
পুনরুত্থানের আশা না করেই
রাজা সহাস্যে সেসব এপিটাফ লটকে দিতে পারেন
ক্রুশের গায়ে। এমনকি কিছুদিন বাদে রাজা
কাঁদতেও পারেন 'আমার মৃত সন্তানেরা'-বলে।
আজও বাকি আছে ক্রুশ বিদ্ধ হবার?!?
কি এসে যায় আমার, কোনো সৈনিক বুকে
বর্শার খোঁচা দিল কি দিলনা তাতে,
আর তো রক্ত নেই ওরা জেনে গেছে.

৯ হরিজনকে বিহারে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পাটনা, ২৮শে ডিসেম্বর
সূর্যের আলো অথবা ডিটারজেন্ট কেবা ধুন কুরুেছে।
সামন্ত-প্রভুদের ঐ গুণ্ডাবাহিনীর নাম 'আনন্দাইট সেনা'
আমার মনে হয় নিশ্চয় ডিটারজেন্ট থেকেই নামটা
নেওয়া – অমলা পরিষ্কার 'ধুয়ে রাহে যাতে'
(জনমুক্তি পরিষদ)
নিন্দা করবো? কাহার জন্যে!! – প্রতিবাদ?
শুধু শাদা তাতে কি এসে যাবে।
আয়নার মুখোমুখি ও কি শক্তি ঘৃণা-ভক্তি হয়েছে কেন
আমার কলমের দিকে চেয়ে— না: রিপোর্ট আমায়
লিখতেই হবে সৎ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ : গতবুধবার দক্ষিণ
বিহারের লক্ষী জেলার মানিকপুরা থানার জাগোতি গ্রামের
[illegible]... ...

সে এক রূপকথারই দেশ ....

বিশেষ প্রতিবেদন : ঋজু রায়। আমাদের সবকিছুই সবসময়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অন্তত আড়ে ছুয়াত্তর শতাংশ কম হয়ে থাকে। নবীকরণের হাড়পত্র, কবিতার লাইসেন্স এবং পেটেন্ট নং, শুক্রানুর সংখ্যা, লোহিত কণিকার গাঢ়ত্ব ইত্যাদি সমস্ত বিশ্বের সরকারী কাগজপত্র কিছু হিসেব বহির্ভূত লেনদেনের সঙ্গে জড়িত – অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি জিনিস যেমন কাফ সিরাপ, গাঁজা, নিউজপ্রিন্ট, ইলেকট্রিসিটি, যে সমস্তগুলি খোলাবাজারে বিক্রী নিষিদ্ধ শুধু ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করতে হয় বড় রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে সেখানেও জোগানের চেয়ে চাহিদা সবসময় কম। সেলুনে চুলদাড়ি এবং শবদাহনের প্রতিযোগিক একই হারে বাড়লেও দেড়শ লোকের সংখ্যাই আপাতত বাজারে বেশী। যাক ও সমস্ত জটিল পরিসংখ্যানগত বিষয় ছেড়ে কমার্শিয়াল ব্রেক হিসাবে একটু মিচকেমি করা যাক – আপাতত ভারতবর্ষে প্রতি দম্পতির সন্তান সংখ্যা সাড়ে তিন; ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির হার ১.৭৫ শতাংশ প্রতি বছর - আগামী প্রজন্মের সেই ভাবী শিশুর উপর জীবন সংগ্রামের বোঝা অন্তত তিনগুন হবে - তাই তার জন্য এখনই অবশ্যই ক্যাডবেরী আর মিউচুয়াল বণ্ড কিনে রাখবো ভাবছি = ডিং ডং....
পাশকোর্সে ফেল করা বিষয় পড়া যাবার মত; বর্তমানে সরকার বাহাদুর আরও একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন শিক্ষাখাতে - যা হল টেকনোলজি বন্ধ করা। কমপিউটার ব্যবহার করে এ বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন। সেদিন একজন বিনাটিকিটের যাত্রীকে, টিকিট চেকারের কর্তব্য অবহেলা সম্পর্কে প্রতিবাদমূলক সুচিন্তিত মতপ্রকাশের জন্য রেলকর্তৃপক্ষের তরফে পুরস্কৃত করা হয়েছে আর ঐ দিনই আমার মাতৃদেবী আমায় অবসন্নতার বদলে অপোগণ্ড বলাতেই ঔচিত্য খুঁজে পেয়েছেন।

মানবেন্দ্র এটা লিখেছেন ১৯৮৫-তে! কে জানে পরবর্তী দশ বছরেও আমরা কয়েকজন ছাড়া সেসময় পর্যন্ত হয়তো কেউই তা থেকে বিশেষ কিছু শেখেননি!-

যাই হোক, 'দৈনন্দিন' ছিল জিতেন্দ্র-নির্মলেন্দ্রাদির 'অ্যাডভেঞ্চারস্ ইন মার্ক্সিজম'-এর পয়লা ধাপ। সে আরও অনেক বিস্তৃত কাহিনি, এখানে যেটুকু বলবার—জিতেন্দ্র-কমলেন্দ্র-নির্মলেন্দ্রাদির সেই জমজমাট সভার অন্তরালে ছিলেন এক মানব-ইন্দ্র, তিনি অনুবাদেন্দ্র।

জানি না অনুবাদেন্দ্র এই কাগজ দেখেছিলেন কিনা। হয়তো দেখেছিলেন, কারণ তাঁকে কফি-হাউসে মাঝেমাঝে দেখা যেত সেসময়, হতে পারে দেখেও কোনরকম উৎসাহ দেখাননি, আর তা নিয়ে আমাদের মাথা-ব্যথা ছিল না। মানবেন্দ্র এইসব ভিনদিশি কবিদের অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন প্রায় আমাদের জন্মের সময় থেকেই। হোলুব মিউশ পোপা ইত্যাদি পূর্ব ইউরোপের কবিদের অনুবাদ করেছেন, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বাঙালি পাঠকের সাথে, কিন্তু সেগুলি যখন, লভ্য বই হিসেবে বেরোচ্ছে বাংলায়, আমরা সদ্য কৈশোরে পড়তে শুরু করছি সেসব, সমগ্র বিশ্বসহ তখন পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট ব্লক ভেঙে পড়ছে, ভেঙে যাচ্ছে সোভিয়েত। ভুললে চলবে না এঁরা ষাটের দশকের প্রখ্যাত কবি। বাংলায় যখন বই বের হচ্ছে তখন তাঁরা সকলেই ষাটোর্ধ্ব, মিউশের বয়স সত্তরের উপর। হোলুব এবং পোপা আমাদের সুনীল-শক্তির চেয়েও দশ-বছরের বড়ো, পার্‌রা এবং মিউশ অন্তত কুড়ি বছরের! তবু হোলুব, মিউশ, পোপা, পার্‌রা-কে ওই বয়সে ঢের বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল

বহুল প্রচলিত বাংলা কবিতার তুলনায়—সে শুধু মানবেন্দ্র-র উপস্থাপনার গুণে। কবিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির জন্য এই ষাটোর্ধ্ব বিদেশি কবিরাই তরুণতম হয়ে ওঠেন আমাদের চোখে। মানবেন্দ্র কি তখন বুঝেছিলেন যে এঁরা বা এঁদের বিপ্লবী কবিতা তথাকথিত মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিপ্রতীপে কাজ করছে? এই বঙ্গদেশে 'সিপিয়েমি কমিউনিজম'-এ বাস করছিলেন বলেই কি তিনি মিউশের প্রতি অতটা কঠোর! নাকি তখনও তাঁরও কাটেনি 'প্রলম্বিত-কৈশোর'? সেকথা বলতে পারবেন তাঁর তৎকালীন নিকটজনেরা। ১৯৯০-এ তৎকালীন চেকোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট ভাৎস্লাভ হাভেল লিখিত মনঃসংযোগের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা-র অনুবাদের শেষে হাভেলের নাটকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মানবেন্দ্র যা লিখেছিলেন তা হয়তো উত্তর হতে পারে ওই সময়ের পরিস্থিতির—"'প্রলোভন'-এর বিষয় ফাউস্টপুরাণ—নতুনভাবে দেখা ফাউস্ট—আর অনেকের মতে (এবং হাভেলও কথাটা উড়িয়ে দেন না) এই প্রলোভনের শিকার, অর্থাৎ ফাউস্ট, স্বয়ং হাভেল। এর আগে হাভেল নিজে কোনো নাটকে হাজির ছিলেন না—তিনি শুধু আড়াল থেকে স্থানে টেনে পুতুল নাচাতেন। কিন্তু এখন তিনি কি অন্য-কারু পুতুলনাচের পুতুল? ইতিহাস এ-প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই 'শিগগিরই' দেবে। তবে আমি যে সেই ১৯৭৩-এ আলোচনার নাম দিয়েছিলাম 'বিদূষক বাচস্পতি' সেটা বোধহয় খুব-একটা ভুল করিনি—ষাটের দশকের বিদূষক এখন চেখদেশের বাচস্পতি—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি। পুরুৎ কাজ হারিয়ে ভাঁড় হয়ে গিয়েছিল—এখন ভাঁড় আবার পুরুতের ভূমিকায় পুনরাবির্ভূত। ইতিহাসের মতো রসিক

পরিহাসপ্রিয় আর-কিছু আছে? ইতিহাস কাকে কখন তুলছে কাকে কখন ফেলছে তার কোনো চটজলদি রূপরেখা তৈরি করা হয়তো অসম্ভব। তবে চেখদেশের ইতিহাসের পটে যে ওলোটপালোট বদল হ'লো, শেষ অব্দি তার জের, তার জল মোলডাউ নদী দিয়ে কোথায় গড়াবে কে জানে?"

—এর মাঝেও কি ছিল কোনো গোপন আশাবাদ!? ! আমার জানা নেই, কারণ তাঁর সাথে আলাপিত হবার কোনো ইচ্ছা তখন আমার ছিল না। যেমন আজও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার বই আমি পড়িনি, তরজমাকৃত কবিতা আমার কাছে তাঁরই কবিতা, কতশত অখ্যাত বাঙালি কবি গল্পকারকে তিনি তাঁর তরজমার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন নতুনতর কিছু লেখার জন্য সে হিসাব কোনদিনই করে ওঠা যাবে না, তিনি এই বাংলার অনেক 'কবিদের কবি', ছিলেন, ভবিষ্যতেও হয়ে উঠবেন[৫]। কারণ তাঁর তরজমা থেকেই নতুনেরা জানবে—

কবিতায় সবকিছুই চলে, যা তোমার খুশি
তবে দেখতে হবে তা যেন শাদা পাতার চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়।

[৫] বত্রিশ বছর টানা লিখে চলেও আমার সমস্ত লেখাই আত্মজৈবনিক বা পুস্তক সংক্রান্ত, কবিতা বা গল্প বা যা কিছু অন্যতর, লিখেছি "যেমন খুশি", কয়েকশো বই বানালেও নিজের লেখাগুলো খাতাতেই ফেলে রাখা আছে, বই হয়নি, কারণ আজও 'শাদা' পাতা উৎকৃষ্টতর মনে হয় সমস্ত কিছুর চেয়ে। পঞ্চাশের দোরগোড়ায় এসেও আমার না-লেখক হয়ে থাকবার শিক্ষার পিছনে প্রধান বাঙালি ব্যক্তিটির নাম ৺মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পেটার বিকসেল

আধুনিক
ভারতীয় গল্প ১
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

পাবলো
নেরুদা-র
রচনাসংগ্রহ
অনুবাদ ও সম্পাদনা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জোর্জে আমাদু
এক পাখি
দোয়েলা আর
এক বেড়াল
হলো
অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

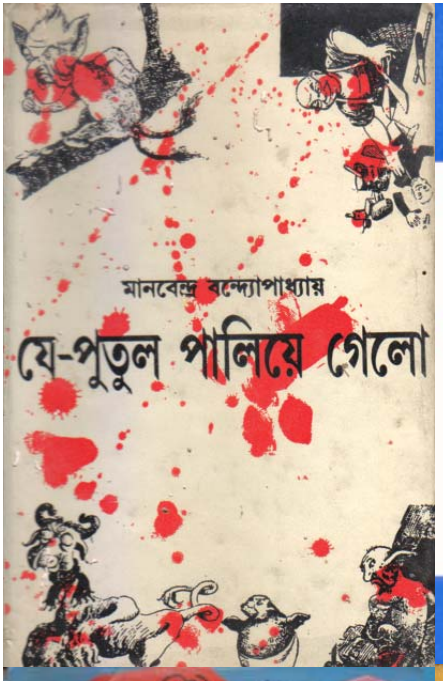
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যে-পুতুল পালিয়ে গেলো

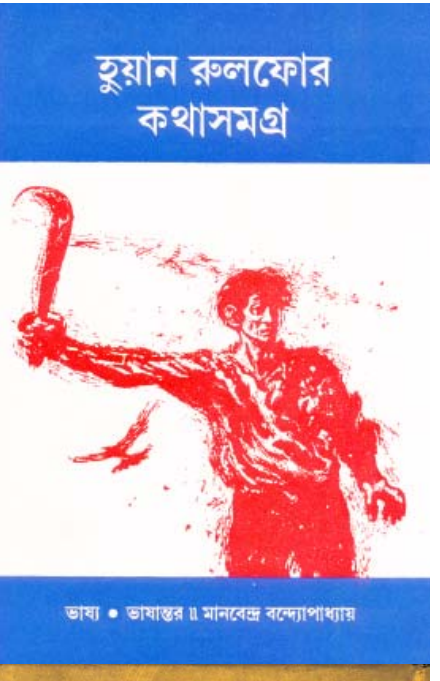
হুয়ান রুলফোর
কথাসমগ্র
ভাষা • ভাষান্তর ॥ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

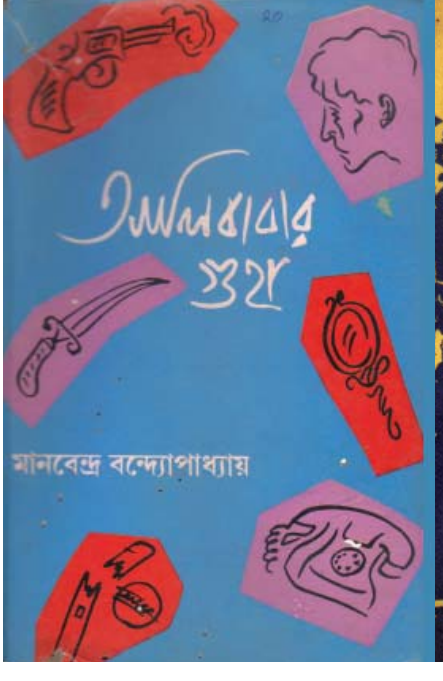
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

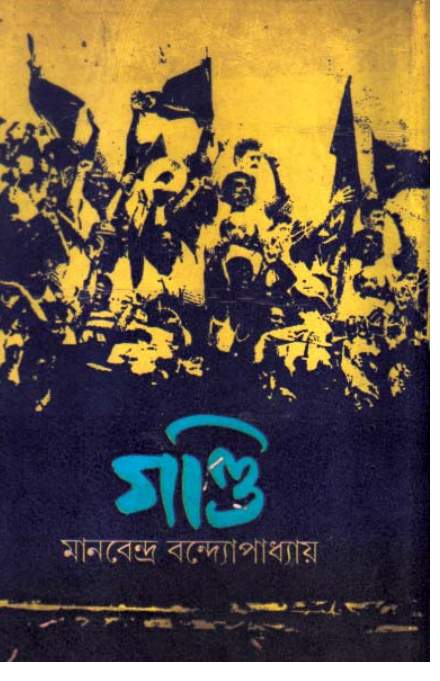
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র ❖ কা ❖ শি ❖ ত